



কখনো মসিহ
কখনো মারহুয়াম
কখনো মাহদি কখনো কৃষ্ণ
কখনো কবি কখনো নবি
কখনো মানুষ কখনো পুরুষ
সবমিলিয়ে বড় আজির
এক চিহ্ন

মির্য়া গোলাম কাদিয়ানি-

কুজলি

রশীদ জামীল

কুজলি

বেণ্ডমিজ

রশীদ জামীল



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

সমর্পণ

১.

সে সফল হয়েছে।

জিঙ্কেস করাহলো, কে সে?

তিনি বললেন, ফিরোজ সফল হয়েছে।

ফিরোজ দালাইলামি; নবিজির জীবদশায় মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার আসওয়াদ আনসির হাতে জাহান্নামের টিকেট ধরিয়ে দেওয়া একজন অখ্যাত সাহাবি।

২.

নবির চাচা হজরত হামজাকে হত্যা করে লাশটি আশি টুকরা করেছিল লোকটি। তওবাহ করে মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা পেয়ে গেলেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। ওয়াহশি ইবনে হারব; ইয়ামামার যুদ্ধে মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার মুসায়লামা কাজ্জাবের হাতে জাহান্নামের টিকেট ধরিয়ে দিতে পারার পর মনটা একটু হালকা হয়েছিল তাঁর।

হজরত ওয়াহশি ইবনে হারব, হজরত ফিরোজ দালাইলামি,
খতমে নবুয়ত আন্দোলনের দুই লড়াকু বীর,
রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

এবং,

ভারত-উপমহাদেশে খতমে নবুওয়তের কালজয়ী সিপাহসালার পির মেহের আলি শাহ,
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরি, আতাউল্লাহ শাহ বুখারি, আল্লামা ইউসুফ বানুরি, মাওলানা
ইদ্রিস কান্কেলবি...নাউয়ারাল্লাহু মারাকিদাহুম।

অনুবন্ধ

রাত আছে বলেই দিনের এত দাম। অন্ধকার না থাকলে আলোর কদর বোঝা যেত না। মানুষ গুনাহ করে তবুও মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, এমনকী ফেরেশতা থেকেও; যারা কোনো গুনাহ করেন না। কারণটা কী?

কারণ হলো, ফেরেশতাদের গুনাহ করার অ্যাবিলিটিই নেই। তাদের পেছনে শয়তানও লাগানো নেই। সুতরাং তাঁরা গুনাহ করেন না— এখানটায় তাদের বিশেষ কৃতিত্বেরও কিছু নেই। মানুষের গুনাহ করার ক্ষমতা আছে, শয়তানও পেছনে লাগানো। তবুও মানুষ— যে মানুষ নিজেকে একটু বাঁচিয়ে চলতে পারে, সে-ই হয় সৃষ্টির সেরা।

‘যে মানুষ...’ সৃষ্টির সেরা কোন মানুষ?

সব মানুষই কি তবে সেরা নয়?

সব মানুষই শ্রেষ্ঠ নয়?

না, মানুষ মাত্রই সেরা নয়। কিছু মানুষ ফেরেশতা থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিছু মানুষ আবার জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট। কিছু মানুষের ব্যাপারে কুরআন বলেছে, ‘তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারচেও নিকৃষ্ট।’ মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ নিজেদের এত নীচে নিয়ে যায় যে, জানোয়ারও এত নীচে নামে না।

নবিজির খতমে নবুয়ত হলো এমন একটি আকিদা, যে আকিদায় পৃথিবীর সকল জীব-জানোয়ারও বিশ্বাস করে। তারা যখনই সুযোগ পেয়েছে, তারা তাদের বিশ্বাসের কথা জানান দিয়েছে। সুতরাং একথা নির্দিধায় বলা যায় কোনো মানুষ যদি খতমে নবুওয়তের আকিদায় বিশ্বাস করে না, যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে নতুন কোনো নবি আসবেন- বিশ্বাস করে, তবে সে জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট।

শুধু তাই নয়, কেউ যদি নবিজির পরে নতুন করে নবুওয়তের দাবি করে আর অন্য কেউ এই অর্থে তার নবুওয়তের পক্ষে দলিল দেখাতে বলে যে— যদি সঠিক দলিল দেখাতে পারে তাহলে না-হয় তাকে নবি হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবা যাবে— তাহলেও ঈমান থাকবে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পরে আর কোনো নবির জন্ম হবে না। নতুন কোনো নবি আসবেন না। আসার দরকারও নেই। মিশন কমপ্লিট। তারপরও যুগে যুগে অনেক বাটপার নবুওয়তের দাবি করেছে। এমনটা যে ঘটবে, সেটা নবিজি আগেই জানিয়েছেন। বলেছেন, ‘আমার পরে ত্রিশজনের মতো বেইমান নিজেকে নবি দাবি করবে, অথচ আমি হলাম শেষ নবি। আমার পরে নতুন কোনো নবি আসবেন না।’

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে জন্মানো মির্জা গোলাম কাদিয়ানি বেইমানির এই লাইনে সর্বশেষ নাম। এর আগে যারাই নবুওয়তের দাবি করেছিল, মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের ফিতনাও দাফন হয়ে গেছে। কিন্তু মির্জা মারা যাওয়ার শতবছর পরেও তার ফিতনা এখনও উন্মতকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। রং-বেরঙ-এর ফিতনা রকমারি পোশাক পরে উন্মতের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে সব ছাড়িয়ে কাদিয়ানি ফিতনাকেই আমার কাছে বেশি ইফেক্টিভ মনে হচ্ছে। সকল মুসলমানকে যার যার অবস্থান থেকে খতমে নবুওয়তের আকিদার প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা রাখা দরকার। আর যাতে একজন মুসলমানকেও ওরা বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমাদের যে ভাইরা ইতোমধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তারা যাতে ইসলামে ফিরে আসে, সেজন্য এভরি সিঙ্গেল মুসলমানকে যার যার সাধ্যমতো কাজ করতে হবে। আর কাজটা করতে হবে কুরআনি ফর্মুলায়, ‘মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করো কৌশল এবং সুন্দর কথার মাধ্যমে।’

বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে। বাঁচার জন্য জানা জরুরি। কাদিয়ানি কারা, কী তাদের আকিদা, তাদের গুরু মির্জা গোলাম কাদিয়ানি কে ছিল, কেমন ছিল এবং কেন ছিল, কেন কাদিয়ানিরা অমুসলিম... পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা দরকার। আগে জানতে হবে, তারপর অন্যান্য মুসলমানকে জানাতে হবে। আলো জ্বালতে পারলে অন্ধকার দূর করার জন্য আর মিছিল-মিটিং লাগে না। আলোর উপস্থিতি মানেই অন্ধকারের বিদায়, Farewell to all types of temptational drakness.

মনে রাখতে হবে কাদিয়ানিদের অধিকাংশই কাদিয়ানির ঘরের কাদিয়ানি। মানে, একজন কাদিয়ানির ঘরে জন্ম হয়েছে বলে তারা অটোমেটিক কাদিয়ানি হয়ে গেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহপাক আমাদের কোনো কাদিয়ানি মায়ের পেটে জন্ম দেননি। দিলে কী হতো?

সুতরাং যারা কাদিয়ানি পরিবারে জন্মেছে বলে বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে আছে, আমাদের উচিত তাদেরকে সুস্থতার পথে ফেরানো। পাশাপাশি যারা আলো ভেবে আলোয়ার পেছনে ছুটেছে, তাদেরকেও আত্মাহুতির পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর এজন্য মির্জা গোলাম কাদিয়ানির আসল রূপ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

বইটি লিখতে গিয়ে দলিল ঘাটাঘাটি-জনিত সহায়তায় বরাবরের মতো কাছে ছিলেন হাফিজ মাওলানা নুমান আহমদ। জাজাহুল্লাহ তাআলা। প্রথমবারের মতো আমার কোনো বই প্রকাশে অগ্রহী হওয়ায় খ্যাতিমান প্রকাশনী গার্ডিয়ান পাবলিকেশন এবং গার্ডিয়ানের গার্ডিয়ান নুর মোহাম্মদ’র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইটির কল্যাণে একজন মানুষও যদি কাদিয়ানি বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে ইসলামে ফিরে আসে, একজন মুসলমানও যদি উপকৃত হয়, সেটাই হবে সার্থকতা। হতে পারে, লেখক-প্রকাশকের জন্য সেটা নবিজির শাফাআতের ওয়াসিলাহও। আল্লাহপাক কবুল করার মালিক।

রশীদ জামীল

নিউইয়র্ক শনিবার, এপ্রিল ৮, ২০১৯

RJSYLB@YAHOO.CO.UK

বিষয় সূচি

- ✓ মির্জার নির্যাস
- ✓ পরিভাষার পরিচর্যা
- ✓ নবুওয়তের মূলনীতি
- ✓ দলিলে নবুয়ত
- ✓ আওসাফে নবুয়ত
- ✓ আকিদায়ে খতমে নবুয়ত
- ✓ রাসূল এবং শেষনবি
- ✓ সর্বালমে খতমে নবুয়ত
- ✓ হায়াতে ইসা (আ.)
- ✓ হজরত ইসা (আ.) জীবিত না মৃত
- ✓ ইসার প্রত্যাবর্তন
- ✓ যুগে যুগে নবুওয়তের দাবি
- ✓ মির্জা কাদিয়ানি ভিশন এবং মিশন
- ✓ জিনিসটা আসলে কী ছিল
- ✓ ইয়াল্লাশ
- ✓ মির্জার খবাসত
- ✓ মির্জার চরিত্র
- ✓ মির্জা গোলাম কালিমা চোর
- ✓ মির্জা কাদিয়ানি নামেই মিথ্যাবাদী
- ✓ মির্জার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিথ্যা প্রমাণিত
- ✓ তাকে নবি না মানলে কাফির
- ✓ কার ফতওয়ায় কে কাফির মির্জার জবানবন্দি
- ✓ খতমে নবুয়ত ইস্যুতে মুসলমানের আকিদা

আমর্শ

এক

নবিগণের নাম নিলে ‘আলাইহিস সালাম’ বলতে হয়। বইটিতে অনেক নবির নাম এসেছে। কারও নাম বারবার। আলাইহিস সালাম জুড়ে দেওয়া না থাকলে পাঠক যেন আলাইহিস সালাম পাঠ করে নেন।

দুই

মির্জা গোলাম কাদিয়ানির উদ্ধৃতিগুলোর প্রায় প্রতিটি বাক্যই ‘আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ’ বলার মতো। আল্লাহ, নবি রাসূল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে এত নোংরা এবং অশ্লীল ভাষায় মির্জার আগে আর কেউ কিছু বকেছিল বলে আমার জানা নেই। লাইনে লাইনে নাউজুবিল্লাহ লিখলে বইয়ের বড়ো একটা অংশ নাউজুবিল্লাময় হয়ে যেত। বিশ্বাস করি যথাস্থানে যথাযথ শব্দ পাঠকের মুখ থেকে অটোমেটিকলি বেরিয়ে আসবে।

তিন

মির্জা কাদিয়ানির রেফারেন্সগুলোর বেশিরভাগ তার কিতাবাদির প্রিন্ট সংস্করণ থেকে নেওয়া। গুটিকতক পিডিএফ ভার্সন থেকে। দু-একটি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে। কথাটি বলে রাখার কারণ, কেউ যেন পৃষ্ঠা নাম্বার মিলাতে চাইলে বিভ্রান্ত না হন।

মির্জার নির্যাস

পৃথিবীর ইতিহাসে মির্জা গোলাম কাদিয়ানির মতো ধর্মাশ্রয়ী ধোঁকাবাজ দ্বিতীয় আরেকটির জন্ম হয়েছে বলে কেউ বলতে পারবে না। এর আগে কেউ নিজেকে সংস্কারক দাবি করেছে, কেউ নবি, কেউ খোদা; কিন্তু মির্জা ছিল বেইমানির আঙিনায় একের ভেতর সব। মুজাদ্দিদ, ইসা মসিহ, ইমাম মাহদি, আল্লাহর নবি, আল্লাহর পুত্র, আল্লাহর স্ত্রী, স্বয়ং আল্লাহ, শ্রী কৃষ্ণ... কিছুই বাদ রাখেনি সে। তবে সে অনেক কিছু হওয়ার দাবি করলেও, কোথাও মানুষ হওয়ার দাবি করেছে বলে আমার চোখে পড়েনি। বরং উলটোটাই পাওয়া গেছে। সে তার নিজেকে ডাস্টবিনের কীড়া বলে পরিচয় দিয়েছে। বলেছে, আমি মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত নই; আমি হলাম ডাস্টবিনের কীট।

যদিও কাদিয়ানিরা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মির্জার জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ লিখে রেখেছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো মির্জার জন্ম ১৮৩৯/৪০ সালে। সেটা মির্জার নিজের লেখা থেকেই প্রমাণীত। বয়স নিয়ে এই কারচুপিটা তারা কেন করল— পাঠককে এটা জানতে হলে মির্জার ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেখানেই বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে জন্ম নেওয়া মির্জা গোলাম কাদিয়ানির প্রথম দাবি ছিল, সে একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। তারপর ইসা মসিহ। তারপর ইমাম মাহদি। তারপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তারপর স্বয়ং খোদা। মির্জা কাদিয়ানির মেঝে ছেলে মির্জা বশির আহমদের লেখা সিরাতুল মাহদি প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৫, রেওয়ায়াত নং ৪৭-এ দেওয়া তথ্যের আলোকে মির্জার ধোঁকাবাজির ধারাবাহিকতা ছিল এমন—

১৮৮২-তে মির্জা কাদিয়ানির কাছে তার খোদার কাছ থেকে এলহামাত আসা শুরু হয়। ডিসেম্বর ১৮৮৮-তে সে বায়আতের ঘোষণা দেয়। ১৮৮৯-তে বায়ত গ্রহণ শুরু করে এবং আহমদিয়া নামে নতুন ফিরকার জন্ম দেয়। তখন পর্যন্ত তার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি ছিল। ১৮৯১ তে সে নিজেকে মসিহ বলে ঘোষণা দেয় এবং ১৯০৪ সালে এসে মসিলে কৃষ্ণ আলাইহিস সালাম হওয়ার কথা জানায়...

... মসিলে কৃষ্ণ আলাইহিস সালাম, বুঝতে পারছি পাঠকের কাছে অংশটা একটু কেমন লাগছে। মির্জার নিজের বউয়ের পেটের ছেলে তার বাবাকে কৃষ্ণ-সদৃশ বলবে আবার কৃষ্ণের নামের সাথে আলাইহিস সালাম জুড়ে দেবে- অবিশ্বাস্য।

জি, বিশ্বাস যেখানে সমাপ্ত, সেখান থেকেই মির্জায়ীদের শুরু। সিরাতুল মাহদি থেকে ঠিক এই অংশটা ছবছ তুলে দিচ্ছি। কনফিউশন দূর হোক।

اور خاص طور پر مثیل کرشن علیہ السلام ہونے کا دعویٰ تو آپ نے اس کے بہت بعد یعنی ۱۹۰۴ میں شائع کیا۔

এবং বিশেষভাবে কৃষ্ণ-সাদৃশ আলাইহিস সালাম হওয়ার দাবি তো তিনি (মির্জা কাদিয়ানি) এর অনেক পরে, অর্থাৎ ১৯০৪ সালে প্রকাশ করেন।

বাবার ব্যাপারে ছেলে মোটেও বাড়িয়ে বলেনি। কথাটি তার বাবা নিজেই বলেছিল। আসবে সেই আলোচনাও, যথাস্থানে। অবাক হওয়ার দরকার নেই। ইয়ে তো কুচভি নেহি। আগে আগে দেখছে হোতাহায় কিয়া।

মির্জা ১৯০৮ সালের ২৬ মে লাহোরে মারা যায়। মৃত্যুর স্থান ময়লার (!) টাংকি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বা ৬৯ বছর।

মির্জার মূল দাবি ছিল দুটি। মসিহে মাওউদ বা প্রতিশ্রুত ইসা ﷺ এবং ইমাম মাহদি ﷺ-কে। সব মিলিয়ে আলোচনাটাকে আমরা যেভাবে সাজাতে পারি,

১. খততে নবুয়ত কাকে বলে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেন শেষ নবি? তাঁরপরে কেন নতুন নবির দরকার হবে না?
২. হজরত ইসা কী জীবিত? তিনি কি আবার পৃথিবীতে আসবেন? তখন কি তিনি নবি থাকবেন? কেন তাঁকে আবারও আসতে হবে?
৩. ইমাম মাহদি কে? কখন তাঁর জন্ম হবে? মানুষ তাঁকে কেমন করে চিনবে? ইসার সাথে মাহদির যুগ: নেতৃত্ব কে দেবেন?
৪. মির্জা গোলাম কাদিয়ানির স্বরূপ কী। সে কার প্রডাক্ট ছিল? কী ছিল তার মিশন? কেমন ছিল তার ধাক্কার বাজার।
৫. এবং কাদিয়ানি ইস্যুতে মুসলমানদের করণীয় কী?

স্মরণ করিয়ে দিই, নবিজি ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং, কাদিয়ানি ইস্যু তথা নবিজির খতমে নবুওয়তের প্রশ্নে কোনো মুসলমানের জন্য মডারেট বা টলারেন্ট হওয়ার সুযোগ নেই। এই ইস্যুতে

মুসলমানদের আপসহীন গ্রহণ করা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

তার মানে এই না যে, ধরো-মারো-কাটো।

তার মানে এই না যে, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও।

ওরা মানুষকে লাইনচ্যুত করছে, লাইনে আনতে হবে।

ওরা ইসলামকে কলুষিত করছে, সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

ইসলাম শুধু শান্তির ধর্মই না, ইসলাম মানেই শান্তি। ইসলাম সব রকমের অসহিষ্ণুতাকে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং কাজ করতে হবে বুদ্ধিভিত্তিক উপায়ে, তবেই কাজ হবে। তবেই কাজের ফলাফল আসবে। নিজে বাঁচব, আমার ভাইবোনগুলোও বাঁচবে।

পরিভাষার পরিচর্যা

কথাবার্তায় আমাদের আরও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। আমাদের পরিভাষাগুলোকে আরও দায়িত্বশীলতার রূপ দেওয়া উচিত; বিশেষত কাদিয়ানিদের ব্যাপারে। এই সতর্কতাটা শব্দ প্রয়োগে বেশিই কাম্য। অনেক সময় আমাদের শব্দগুলো আমাদের আকিদার প্রতিনিধিত্ব করে না। যে কারণে দেখা যায় নিয়ত ভালো, উদ্দেশ্যও মহত কিন্তু ভাষাগত অদূরদর্শিতার কারণে আমরা আমাদের কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছি না।

ভগুনবি।

মিথ্যা নবি।

আহমদিয়া।

ভুল পরিভাষা। কোনো নবি কখনও ভণ্ড হতে পারে না। কোনো ভণ্ড কখনও নবি হয় না। সুতরাং মির্জা গোলাম কাদিয়ানি ভণ্ড নবি ছিল না। সে ছিল একজন ভণ্ড। ভণ্ডকে শুধুই ভণ্ড বলতে হবে, ভণ্ড নবি নয়।

মির্জা গোলাম কাদিয়ানি মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার ছিল না; সে ছিল নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার। কথা দুটো শুনতে প্রায় একই রকম শোনালেও, কথা কিন্তু এক নয়। মিথ্যা নবুয়ত বলে কিছু নেই। নবুয়ত কখনও মিথ্যা হয় না। নবুয়ত মানেই শাস্বত সত্য। কেউ নবুওয়তের মিথ্যা দাবি করলে তাকে মিথ্যানবি নয়; বরং নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার বলা উচিত।

আর অবশ্যই মির্জা কাদিয়ানির অনুসারীরা ‘আহমদিয়া’ নয়। আহমদ হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম। সুতরাং তারা যা কাদিয়ানি, মির্জায়ী, তাদের তাই ডাকা উচিত; আহমদিয়া নয়।

কেউ যদি বলে, তারা নিজেদের নাম দিয়েছে আহমদিয়া, এজন্য তাদের এই নামেই ডাকা হয়। এর অর্থ তাদের আহমদিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, কেবল পরিচয় করানো। এই যাদের যুক্তি, তাদের জানিয়ে দিই কাদিয়ানিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যদি নামের দরকার হয়,

তাহলে আরও অনেক নাম আছে। সেই নামগুলোও তারাই নিজেদের জন্য ঠিক করেছে। তেমন কতগুলো নাম হলো,

মরিয়মি : যেহেতু মির্জার দাবি ছিল সে মরিয়মও।

ইসায়ি : যেহেতু মির্জার দাবি ছিল সে ইসা মসিহ।

কৃষ্ণায়ি : যেহেতু তার দাবি ছিল সে হিন্দুদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ।

আরও অনেক নাম আছে। আর সবগুলোই মির্জার নিজের রাখা নাম। মির্জাকে ছোটবেলা গ্রামের মহিলারা সিন্ধি বা সরকুণ্ডা নামেও ডাকত। মাঝে মধ্যে মির্জার মাও ছেলেকে চমৎকার এসব নামে ডাক দিতেন।

(তথ্যসূত্র: সিরাতুল মাহদি, পৃষ্ঠা ৪০, রেওআয়ত নং-৫১।)

শব্দ প্রয়োগে সতর্কতার কথা বলছিলাম। কিছু কথা আছে যা ব্যাকরণগত সঠিক, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ভুল। যেমন, দুজন লোক একসাথে থাকে। এটার আক্ষরিক ইংরেজি হবে They live together. কিন্তু বর্তমান সময়ে লিভটুগেদার একটি বিশেষ পরিভাষা হয়ে গেছে। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে যদি বিবাহ-বহির্ভূত একসাথে থাকে, তখন বলা হয় They are living together. তারা লিভটুগেদার করছে। সুতরাং এখন দুজন লোক একসাথে বা একঘরে থাকলেই সেটাকে লিভটুগেদার বলা যাবে না।

প্রপোজ (propose) মানে কারও সামনে কোনো প্রস্তাব রাখা। এখন যেহেতু প্রপোজ একটি বিশেষ প্রস্তাবের সাথে বিশেষায়িত হয়ে গেছে, একজন আরেকজনকে প্রেমের প্রস্তাব দিলে সেটাকে বলা হয় প্রপোজ করা। এজন্য এখন যেকোনো প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই ‘প্রপোজ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। ভাই তার বোনের সামনে কিছু একটা উত্থাপন করল অথবা কোনো কিছুর প্রস্তাব দিলো। তখন কি কেউ বলবে, ‘ভাই তার বোনকে প্রপোজ করেছে!’

সব ভাষাতেই এমন উদাহরণ আছে। আরবিতে ভালোবাসার সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রতিশব্দ হলো ইশক। কিন্তু ইশক শব্দটি সাধারণত অবৈধ প্রেম-প্ৰীতির সাথে জড়িয়ে আছে বিধায়, আল্লাহপাক তাঁর নবিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসলেও তা বোঝার জন্য ‘ইশক’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। কুরআনে কারিমে যেখানেই ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছেন, ইশক’র স্থলে ‘হুব্ব’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

‘সালাত’ অর্থ শারীরিক কসরত। কিন্তু যেকোনো শারীরিক কসরতকে ‘সালাত’ বলা হয় না। শব্দটি নামাজের জন্য খাস হয়ে আছে। যেকোনো কাজের ইচ্ছাকেই হজ বলা হয় না; যদিও হজের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা পোষণ করা। যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকলেই সেটাকে সাওম বা রোজা বলা হয় না; যদিও সাওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা।

কাজটি কিন্তু আমরাও করে থাকি। ‘রাহমাতুল্লাহি আলাইহি’ অর্থ তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। কিন্তু বাক্যটিকে আমরা মরহুমদের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলেছি। যে কারণে অর্থগত সমস্যা না থাকলেও জীবিত কারও নামের সাথে আমরা এই বাক্যটি সাধারণত ব্যবহার করি না।

আবার, রসগোল্লাকে রসগোল্লা নাম না দিয়েও মুখে দিলে যেমন মিষ্টিই লাগবে, তেমনি নিমপাতার পানিকে রুহ আফজা নাম দিয়ে দিলেও তিতকুটে ভাব দূর হয়ে যাবে না। সুতরাং, নর্দমার কীটকে যেকোনো নামেই ডাকা হোক— তা দুর্গন্ধই ছড়াবে।

উপরের অভিব্যক্তিগুলো যদি বোধগম্য হয়ে থাকে, তাহলে কথাটি বোঝানো সহজ হবে। ‘কাফির’ একটি কুরআনি পরিভাষা। আল্লাহকে যারা মানে না। আল্লাহ না-মানা মানে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে। আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো বিধান মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করে। নবিকে অস্বীকার করার এক অর্থ নবিকে অপমান করা। নবিকে অপমান করার এক অর্থ নবির অবস্থানে অন্য কাউকে বসিয়ে দেওয়া। এই অর্থে কেউ যদি নবিজির পরে নিজেকে নবি দাবি করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফির। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে তা হলো, শয়তানকে ডেবিল বললেও শয়তান যেমন শয়তানই থাকে, তেমনি একই সূত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে কাফিরকে কাফির না বলে অমুসলিম বলতে পারি। অর্থ তো একই থাকছে। সমস্যা কী!

এই সময়ে কেউ চাইলেও বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না। চাইলেও পারবে না, কোনোদিকে ড্রাক্সেপ না করে যেমন খুশি চলতে, যা খুশি বলতে। সুতরাং বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার মাথায় নিয়ে কথা বলা ভালো। রাজনীতি বললাম, কারণ, সবকিছুর মূলেই আছে রাজনীতি। কাদিয়ানি ফিতনার গোড়াপত্তন হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে।

কাদিয়ানি সমস্যা কোনো লোকাল সমস্যা নয়। এটাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা ভাবলে ভুল হবে। এর জড় অনেক গভীরে; ডালপালা অনেক বিস্তৃত। সুতরাং আমাদের কথা ও কাজ সেভাবেই হওয়া দরকার।

আরেকটি ব্যাপার। প্রগতির তকমাধারী চোপা-প্রতিক্রিয়াশীল একটি শ্রেণি সব সময় এই বলে কাদিয়ানিদের পক্ষ অবলম্বন করে বেড়ায়, ‘গণতান্ত্রিক একটি দেশে কাদিয়ানিদের সভা-সমাবেশ করার সুযোগ থাকবে না কেন? স্বাধীন মতো প্রকাশের অধিকার তো তাদেরও আছে। সুতরাং কাদিয়ানিদের বিরোধিতা করা অগণতান্ত্রিক এবং উগ্রতা।’

যারা অতিপ্রগতির এমন ভাঙা রেকর্ড বাজায়, তাদের ভোঁতা মস্তিষ্কে গুতা দিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশে ‘সনাতন’ ধর্মের অনেক মানুষ আছে। তাঁরা তাদের ধর্মীয় রীতিতে ধর্মপালন করে। এটা তাদের অধিকার। এখন কিছুলোক যদি নিজেদের হিন্দু ধর্মাবলম্বি দাবি করে এবং তাদের ইচ্ছামতো দেব-দেবী ডিজাইন করে পূজা করতে আরম্ভ করে, তারা যদি দশহাতওয়ালী দেবী দুর্গার আটার হাত লাগিয়ে দিয়ে এবং দুর্গার পায়ের নিচে থাকা তার স্বামী শিবের মূর্তি সরিয়ে সেখানে হনুমানকে বসায় আর বলে, জয় বাবা হনুমান, তাহলে সেটা কি ঠিক হবে?

হিন্দুরা সেটা কি মেনে নেবে?

নাকি হিন্দু ধর্মের দেবীকে বিকৃত করার কারণে তারা ফুসে উঠবে? অতিপ্রগতিবাজরা কি তখন বলবে, ‘এটা তাদের অধিকার, যে যার মতো করতেই পারে, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সকলেরই আছে!’

বিশ্বাস করি, হিন্দু ধর্মের প্রতি যাদের সামান্যতম শ্রদ্ধা আছে, তাদের কেউই ধর্ম নিয়ে এমন ফাইজলামি মেনে নেবে না। অথচ আশ্চর্য হই যখন মুসলমান নামধারী কেউ-কাউকে কাদিয়ানি প্রশ্নে প্রগতির ডুগডুগি বাজাতে দেখি।

কথা পরিষ্কার। কাদিয়ানিরা কাদিয়ানি ধর্ম বা মির্জায়ী ধর্ম পালন করুক। সভা সমাবেশ করুক। পূজা-পার্বণ-ইবাদত যা খুশি করুক। মুসলমানদের কোনো সমস্যা নেই। তবে মুসলমান নাম নিয়ে নবিজির নবুওয়তের মর্যাদা নিয়ে ফাইজলামি করলে, আমাদের অবশ্যই সমস্যা আছে। বিশ্ব মুসলিম এমন ফাইজলামি অতীতেও সহ্য করেনি, আগামীতেও করবে না।

নবুওয়তের মূলনীতি

মির্জা গোলাম কাদিয়ানির বাঁদরামী নিয়ে কথা বলার আগে চলুন একনজরে দেখে নিই নবি হওয়ার মূলনীতিটা কী? একজন নবিকে নবি হতে হলে তাঁর মধ্যে কী কী গুণাবলি থাকতে হয়।

চাইলেই নবি হয়ে যাওয়া যায় না। কারও ইচ্ছা হলো আর নবুওয়তের দাবি করে বসল, কিছুলোক তাঁকে নবি হিসেবে গ্রহণ করে নিল- হবে না। পৃথিবীর সব মানুষ একত্রিত হয়েও যদি কাউকে নবি বানিয়ে দেয়, তাতেও নবি হওয়া হবে না। নবুয়ত ইলেকশনের মাধ্যমে নয়, সিলেকশনের মাধ্যমে হয়। নবি হতে হয় আল্লাহর সিলেকশনে।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তো আর গায়েবি আওয়াজের মাধ্যমে বলে দেন না কাকে তিনি নবুয়ত দান করলেন। কাকে নবি হিসেবে মনোনীত করলেন। তাহলে মানুষ কী করে বোঝবে, কে আল্লাহর নবি? মানুষ কীভাবে নিশ্চিত হবে, কে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত আর আর কে মিথ্যাবাদী?

আপাতদৃষ্টে এই জটিল সমস্যার সমাধান হলো যিনি নবি হবেন, তাঁর মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার থাকবে, যা অন্য কারও মাঝে থাকবে না। নবি হতে হলে দলিলে নবুয়ত লাগবে। নবুওয়তের প্রধান দলিল হবে মুজেজা। অন্যকথায় নবি হওয়ার জন্য নবিদের মধ্যে আওসাফে নবুয়ত পরিপূর্ণভাবে থাকতে হবে।

নবিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য, অর্থাৎ কে নবি আর কে নবি হওয়ার মিথ্যা দাবি করছে, সেটা বোঝার জন্য নবিগণের কিছু কমন গুণাবলি আছে যাকে আওসাফে নবুয়ত বলা হয়। নবি হলে এই গুণগুলো তাঁর মাঝে থাকতেই হবে; সবগুলোই থাকতে হবে। একটার অনুপস্থিতি মানেই তিনি আর নবি নন।

আওসাফে নবুয়ত নিয়ে একটু পরে বিস্তারিত কথা হবে। আপাতত একনজরে দেখে নিই আওসাফে নবুওয়তের মৌলিক শর্তগুলো কী কী?

১. নবিকে মানুষ হতে হবে। আল্লাহপাক মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জাতির জন্য কাউকে নবি বানাননি; না জিনদের মধ্যে আর না ফেরেশতা।

২. নবিকে পুরুষ হতে হয়। আল্লাহপাক কোনো নারীকে নবুয়ত দান করেননি। কোনো হিজড়াকে তো প্রশ্নই আসে না।
৩. নবি হওয়ার জন্য আকলে সালিম তথা সুস্থ বোধসম্পন্ন হতে হয়। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া কাউকে আল্লাহ নবুয়ত দান করেননি।
৪. নবির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসতে হবে এবং যিনি নবি হবেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে হবে।
৫. নবিকে মাসুম আনিল খাতা বা গুনাহ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। এটা যেমন নবি হওয়ার আগে, তেমনি নবি হওয়ার পরেও।

মির্জা গোলাম কাদিয়ানির মধ্যে এগুলোর একটিও ছিল না। থাকার কোনো কারণও ছিল না। বর্ণিত গুণগুলো নবিগণের মধ্যে থাকে, কোনো বেইমান, ভণ্ড এবং বাটপারের মধ্যে না। ‘বেইমান বাটপার’ শব্দগুলো কারও কাছে আক্রমণাত্মক মনে হলেও যখন মির্জার আমলনামা সামনে আনা হবে, যখন দেখবেন লোকটি আল্লাহর নবিগণের শানে কেমন জঘন্য শব্দ প্রয়োগ করেছে, তখন মনে হবে, এগুলো তো কিছুই না। আরও কঠিন কিছু বলা উচিত ছিল।

মির্জা নিজেকে কখনও পুরুষই মনে করত না। কখনো কখনো সে নিজেকে নারীও মনে করত; মাথাও ঠিক ছিল না তার। কখন কী বলত আর কী করত— নিজেই বুঝত না। একটা ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য প্রমাণীত হয়নি। তার কাছে ওহি যে আসেনি, সেটা সে নিজেই প্রমাণ করে গেছে। আর এমন গুনাহ খুব কমই আছে যা সে করেনি। বিস্তারিত আসবে সামনে।

ইসলামি শরিয়তে নবি হওয়ার অন্যতম একটি মূলনীতি হলো, প্রথমেই দেখা হবে তার সন্তা, তারপর বক্তব্য। কথাটি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের আলেমগণ খুব সুন্দর করে বলেন। তারা বলেন, ‘পেহলে জাত, ইসকে বাদ বাত।’

যেহেতু নবি দাবি করতে হলে টাকা-পয়সা খরচ করা লাগে না, তাই যে কেউ চাইলেই নিজেকে নবি দাবি করে ফেলতে পারে। এজন্য নবিদের বেলায় শুধু তাঁর ভালো ভালো কথা সামনে রাখলেই হবে না, দেখতে হবে তাঁর স্বভাব চরিত্র কেমন। সেটা নবি হওয়ার মতো কি না।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় ওলামায়ে কেরাম নবিগণের ওয়ারিস হলেও, নবির অবর্তমানে নবির রেখে যাওয়া কাজ উম্মতের ওলামার ওপর বর্তালেও তারা কিন্তু নবি নন। সুতরাং ওলামায়ে কেরামের মাঝে নবিদের স্বভাব এবং চরিত্র হান্ড্রেড পারসেন্ট খুঁজে পেতে চাইলে ভুল হবে।

নবিগণ গুনাহ করেননি। আল্লাহপাক সকল নবিদেরকেই গুনাহ থেকে মুক্ত রেখেছেন। ওলামায়ে কেরাম যেহেতু নবি নয়, সুতরাং তাদের থেকে গুনাহ হতে পারে। তবুও তারা ওয়ারাসাতুল আশিয়া।

নবিগণ জেনে হোক অথবা না-জেনে, কখনো কোনো অন্যায় করেননি। ওলামায়ে কেরামের দ্বারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অন্যায় কাজ হয়েও যেতে পারে। সুতরাং কোনো আলেম থেকে গুনাহ হতে দেখলে চোখ কপালে তুলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারপরও তারা ওয়ারাসাতুল আশিয়া।

কথায় কথা চলে আসে। নবিজি বলে গেছেন, আল ওলামা ওয়ারাসাতুল আশিয়া। আলেমগণ হলেন নবিদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। আবিদগণ বা খুব বেশি আমলদারগণকে নবিজি উত্তরাধিকার ঘোষণা করেননি। সুতরাং নবির ওয়ারিস হওয়ার জন্য আমল নয়, ইলম শর্ত।

কেউ যেন মনে না করে যে, আলেম হয়ে যেতে পারলে আর আমলের দরকার নেই— একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমল সবার জন্যই দরকার। আলেমের জন্য যেমন, গায়রে আলেম বা সাধারণ মুসলমানের জন্যও তেমন।

নবিজি বলেছেন, আলেমগণ আমার উত্তরাধিকারী। এখন নবিকে মানলে নবির কথাও মানতে হবে। যুক্তিতে ধরলে তো ভালোই, না ধরলেও। যদিও নবিজির একটি কথাও অযৌক্তিক না। সবগুলোর পেছনেই যুক্তি আছে। আমার কাছে যদি কোনো কথাকে অযৌক্তিক মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমার জানায় কমতি রয়ে গেছে। জানার চেষ্টা করা উচিত।

নবিজি বলেছেন, আলেমগণ আমার উত্তরাধিকারী।

আলেমগণই কেন?

কারণ কী?

কারণ হলো, মানুষ মারা গেলে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদে তার সন্তানরা ওয়ারিস হয়। মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়েদের মাঝে তাঁর সম্পদ বণ্টিত হয়। নবি যখন ইত্তিকাল করেন, তখন তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদও তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিতরিত হবে— এটাই যুক্তির দাবি।

কেউ মারা গেলে বাড়ি রেখে যায়, গাড়ি রেখে যায়, জাগাজমি রেখে যায়, ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যেতে পারে। সে যা রেখে যায়, ওয়ারিসানদের মধ্যে সেগুলোই বাটোয়ারা হয়। কেউ পায় বাড়ি, কেউ পায় গাড়ি, আবার কেউ হাওরের জমি। এটা নির্ধারিত হয় উত্তরাধিকার আইনের আওতায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। কিন্তু কোনো নবি যখন ইত্তিকাল করেন, তখন তিনি বাড়ি, গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যান না। যদি যানও, তাহলে তাঁর ইত্তিকালের সাথে সাথে রেখে যাওয়া স্থাবর অস্থাবর সব সম্পদ সদকাহ হয়ে যায়। যেমনটি বলেছেন বিশ্বনবি।

তাহলে নবিগণ কী রেখে যান?

আলেমগণ তবে কোন সম্পদের ওয়ারিস হন?

জবাবটা স্বয়ং নবিজিই দিয়ে গেছেন। নবিগণ মারা যাওয়ার পর আলেমগণ টাকা পয়সার ওয়ারিস হন না। তারা নবির ইলমের ওয়ারিস হন। নবিগণ চলে যাওয়ার সময় ইলমই রেখে যায়। আর নবিগণের মূল সম্পদই হলো ইলম। সুতরাং ইলমের ওয়ারিস আলেমই হবেন, সেটাই যুক্তির কথা।

এখন কথা হলো, আলেম যদি দেখতে অসুন্দর হন, তবুও কি নবির ওয়ারিস?

উত্তর হলো, হ্যাঁ।

আলেম যদি নীচ বংশের হন?

উত্তর হলো, হ্যাঁ।

যদি গুনাহ করেন?

তারপরও উত্তর হলো, হ্যাঁ।

এটা কেমন কথা?

জি এটাই হলো কথা। কারণ, এটা নবির কথা।

নবিজি বলেননি, শুধু সুন্দর চেহারার হ্যান্ডসাম আলেমরাই আমার ওয়ারিস হতে পারবে। নবিজি বলেননি, আমার ওয়ারিস হবে সেই আলেম যার বংশ মর্যাদা থাকবে। বলেননি, আমার ওয়ারিস শুধু সেই আলেমরাই হতে পারবে যেকোনো গুনাহ করবে না। নবিজি কোনো শর্ত লাগাননি।

তাহলে কি নবির কথা অযৌক্তিক মনে হলেও মানতে হবে?

আবারো সেই একই জবাব, অবশ্যই মানতে হবে এবং অবশ্যই নবিজির একটি কথাও অযৌক্তিক নয়। সুতরাং যুক্তি খুঁজতে হবে।

একজন মানুষ দুটো ছেলে রেখে মারা গেছে। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুজনেই প্রতিবন্ধি; একজন অন্ধ এবং অন্যজন পঙ্গু। আর দুজনেই দেখতে বদসুরত। আবার দুইটাই বদের হাড়িড। এই অবস্থায়ও সারাদিন মারামারি আর ঝড়গাঝাটি নিয়ে থাকে। আবার মৃত ব্যক্তির পাশের বাড়ির ছেলেগুলো দেখতে ফিটফাট।

মানুষটি মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিস কারা হবে?

অন্ধ এবং পঙ্গু ছেলে দুটো, নাকি পাশের বাড়ির হ্যান্ডসাম ছেলেগুলো?

কার যুক্তি কী বলে?

সবার যুক্তিই একসাথে বলবে, লোকটির রেখে যাওয়া সম্পদ তার অন্ধ পঙ্গু বদসুরত ছেলেরাই পাবে। তারাই হবে সেই সম্পদের মালিক। যদিও তারা শারীরিকভাবে দুর্বল, দেখতে ভালো না, যদিও তাদের স্বভাবও ভালো না, তবুও তারাই বাবার সন্তান। আলেমগণ যেমনই হোন, তাঁরা আলেম এবং তাঁরাই ওয়ারাসাতুল আম্মিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

আমি শরিয়ত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারির কাছে একবার এক মসজিদ কমিটির কিছুলোক গিয়ে বললেন, ‘শাহজি! আমাদের মসজিদের জন্য ভালো একজন ইমাম দরকার। আমাদের একজন ইমাম দিন না।’

শাহজি বললেন, ‘আচ্ছা।’

‘ইমাম যেন ভালো হয়।’

‘ভালো মানে! যেমন?’

তখন তারা ইমামের কিছু কোয়ালিটি তুলে ধরে বলল, ‘বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হবে। বিবাহিত হবে। দেখতে সুন্দর হবে। গলার আওয়াজ মিষ্টি হবে। টাকাপয়সার প্রতি লোভ থাকবে না। মেজাজ হবে শান্ত এবং ঠাণ্ডা। কেউ কিছু বলে ফেললেও রাগ করবে না...’

শাহ সাহেব তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, একটু থাম। আগে একটি বিষয় নিশ্চিত হয়ে নিই। তোমরা আমার কাছে ইমাম চাইতে এসেছ, নাকি নবি চাইতে এসেছ?

লোকগুলো কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শাহ সাহেব বললেন, ‘চাইতে এসেছ আলেম, আর কোয়ালিটি বলছ নবিদের! কেমন করে হবে? তোমরা যে গুণাবলির কথা বলছ, এগুলো তো নবিদের গুণ। এইসব গুণ যাদের মধ্যে থাকে তাদের নবি বলা হয়। আলেমদের মধ্যে এইসব গুণ পুরোপুরি থাকার গ্যারান্টি নেই। কোনো না কোনো ঘাটতি থাকতেই পারে। কারণ, তাঁরা নবি না। নবি হলে সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং সুরক্ষিত হতেন।

আওসাফে নবুয়ত

আওসাফ ওয়াসফর বহুবচন। ওয়াসফ মানে গুণ। নবিদের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণ থাকতে হয়, যেগুলো ছাড়া কেউ নবি হতে পারে না; সোয়া লাখ নবি-রাসূল যে গুণগুলোয় গুণান্বিত ছিলেন।

নবিকে মানুষ হতে হবে। পুরুষ হতে হবে। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে হবে। নবিগণ মাসুম আনিল খাতা হবেন। তাঁরা হবেন মাবউস মিনাল্লাহ। কারও মাঝে যদি এর কোনো একটিরও কমতি থাকে, তিনি আর যাই হোন নবি হতে পারেন না। চলুন একটু বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক।

প্রথম শর্ত : নবিকে মানুষ হতে হবে

আল্লাহপাক পৃথিবীতে সোয়া লাখ নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। সবাই মানুষ ছিলেন। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জাতিতে কোনো নবি পাঠানো হয়নি। আমাদের নবিজিও মানুষ ছিলেন। মানুষ হতে পারা সম্মানের বিষয়। নবিজিকে নুর বলার মাঝে নবিজির সম্মান বেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁর সম্মান সবার উর্ধ্বেই আছে। সকল মানুষ, সকল জিন, সকল নুরের উর্ধ্বে, শুধু আল্লাহ থেকে নিচে।

মির্জা গোলাম কাদিয়ানি মানুষই ছিল না। কথাটি আমার নয়, সে নিজেই জানিয়েছে। সে তার ‘রুহানি খাজাইন বইয়ের একবিংশ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠায় বলেছে,

کرم خاکی ہو مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار
ও আমার প্রিয়জন! আমি হলাম নর্দমার কীট, মানব সন্তান নই।
আমি মানুষের ঘৃণার স্থান এবং মানবতার জন্য কলংক।

‘হো বশর কি যায়ে নফরত...’ ‘বশর’ মানে মানুষ। ‘যায়ে নফরত’ মানে ঘৃণার স্থান। মির্জা বলছে আমি মানুষের ঘৃণার জায়গা। একজন মানুষের শরীরে ঘৃণার জায়গা বলতে দুটি জায়গাকেই বোঝানো হয়; জনস্মুখে যেগুলো উন্মুক্ত করা যায় না। কাদিয়ানিদের জিজ্ঞেস করা দরকার

তোমারা যাকে নবি মানছ, সে তো নিজেকে মানুষের ঘণার স্থান বলছে। কিন্তু সামনের না পেছনের ক্লিয়ার করে বলে যায়নি। তোমারা কেয়া খেয়াল হয়?

ভাবছি, যে লোক নিজেকে মানুষই মনে করত না, সেই লোককে যারা নবি মানতে চায়, তারা কোন কোয়ালিটির মানুষ?

মির্জার অনুসারিরা কথাটিকে ধামার নিচে চাপা দেওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে। তারা বলে, কথাটি মির্জা সাহেব কসরনফসি করে নিজেকে ছোটো দেখানোর জন্য বলেছেন। এটা তাকওয়া ও খোদাভীতির আলামত। আর এই কাজ শুধু মির্জা সাহেবই করেননি, অন্যান্য অনেকেও করেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতবিও নিজেকে কুকুর বলেছেন। বড়োরা এভাবেই বলে থাকেন।

আহাফিরাও বলে, ‘দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতবি নিজেকে কুকুর বলেছেন।’ কথাটি তারা কাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে, একটু কি বোঝা গেল?

মাওলানা নানুতবির কথাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ‘হুমুল্লাজিনা’ বইতে। সেখান থেকে চুম্বক অংশটা নিয়ে আসছি। আরও বিস্তারিতের জন্য সেখানে দেখে নেওয়ার পরামর্শ থাকল।

নানুতবি এবং কুকুর

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতবির ওপর অভিযোগ তিনি কুকুর হওয়ার জন্য আফসোস করে কবিতা লিখেছেন। বলেছেন,

‘উমিদ্ লাকো হে লেকিন বড়ি উমিদহে ইয়ে,
কে হো সেগানে মদিনামে মেরা নাম শুমার।
জিয়ো তো সাত সাগানে হারেমকে তেরো পিরো
মরো তো কায়ে মদিনাকে মুঝকো মুরো মার।’

আশা তো অনেক। বড়ো আশা, যদি মদিনার কুকুরদের সাথে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়ে যেত! তাদের সাথে মদিনার অলিগলিতে ঘুরতাম আর মরে গেলে মদিনার পোকা মাকড় আমাকে খেয়ে ফেলত!

প্রথম কথা হলো, নিজেকে এভাবে ছোটো দেখানো সাহাবায়ে কেরামদেরও স্বভাব ছিল। আল্লামা সুয়ুতি তারিখুল খুলাফায় হজরত মায়াজ ইবনে জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো এরকম—

হজরত আবু বকর সিদ্দিক একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। একটি গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাছটির ডালে একটি পাখি বসে ছিল। তিনি পাখিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

طوبى لك يا طير تأكل من الشجر وتستظل بالشجر

وتصير إلى غير حساب يا ليت أبا بكر مثلك

‘মোবারক হো হে পাখি! কত ভাগ্যবান তুই! গাছ থেকেই খেতে পারছিস! গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিস! কিয়ামতের দিন কোনো হিসেবও দিতে হবে না! হায়! আমি যদি তার মতো হতে পারতাম!’

আবু বকর সিদ্দিক আশরাফুল মাখলুকাত, নবিগণের পরে শ্রেষ্ঠ উম্মত। সেই আবু বকর ‘পাখি’ হতে চান? কারণ, খাশইয়াতুল্লাহ। কারণ, আল্লাহর ভয়। জাহান্নামের আজাবের ভয়। মাওলানা নানুতবি মদিনার কুকুরদের কাতারে নিজে কামনা করলেন কেন? কারণ, মদিনায় এমন কেউ শুয়ে আছেন, যার কাছাকাছি থাকবার জন্য কুকুর হতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার।

মির্জার অমানুষত্বকে মাওলানা নানুতবির বা সিদ্দিকে আকবরের সাথে তুলনা করার সুযোগ নেই। আবুবকর সিদ্দিক এবং কাসিম নানুতবি নিজেদের পাখি বা কুকুর বলেননি। বলেছেন, ইস! যদি পাখি হয়ে যেতাম? যদি কুকুর হয়ে যেতাম, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতাম। পাখি অথবা কুকুর হওয়া এক জিনিস, আর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা অন্য জিনিস।

উপরন্তু কিছু হতে পারার আকাঙ্ক্ষাকে আরবি গ্রামারে ভাষায় জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ বা আকাঙ্ক্ষাসূচক বাক্য বলে। আর মির্জা ডাস্টবিনের কিট হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়নি, সে তার পরিচয় তুলে ধরেছে। যেটাকে আরবি গ্রামারে ভাষায় বলে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ বা সংবাদসূচক বাক্য। আর নিয়ম অনুযায়ী বিধান প্রয়োগ হয় জুমলায়ে খবরিয়্যার সাথে, ইনশাইয়্যার সাথে নয়।

তাহলে মির্জার স্বীকারওক্তি মতোই সে নবি তো দূর বাত, একজন ভদ্র মানুষই ছিল না। এ ব্যাপারে মজার একটি মুনাজেরার কথা শেয়ার করি। মুনাজেরা বা বিতর্ক হয় দলিল ও যুক্তির শক্তিতে। তবে মাঝে মাঝে দলিল থেকে ঝাটকাই বেশি কাজ দেয়।

হিন্দুস্তানে মির্জায়ীদের সাথে মুসলমানের মুনাজেরা ঠিক হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে মুসলমানদের মুনাজির এসে উপস্থিত হতে পারেননি। মুসলমানদের সাথে সাধারণ দিনমজুর একলোক ছিল। সে বলল, ‘আমাকে সুযোগ দাও, আমি কথা বলি।’

মুসলমানরা বললেন, ‘আরে বাবা! এখানে মুনাজেরা হবে, চায়ের দোকানের গপশপ নয়। তুমি কী করবে?’

লোকটি বলল, ‘দাও না একবার সুযোগ। দেখো না কী করি।’

কী আর করা। মুনাজিরও আসেননি। দেওয়া হলো সুযোগ। উঠে দাঁড়াল লোকটি। নিয়ম অনুযায়ী উভয়পক্ষ দশ মিনিট করে কথা বলবে। একপক্ষ যাই বলুক, সময়ের ভেতর প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ করতে পারবে না। যা বলার পরে বলতে হবে।

লোকটি দাঁড়িয়েই শুরু করল মির্জার রুহের ওপর গালি বর্ষণ। গালি মানে গালি যাকে বলে আর কি! মির্জায়ীরা আশা করেনি কেউ মুনাজেরার খোলা মঞ্চে সামনা-সামনি এবং সরাসরি এভাবে গালিগালাজ করতে পারে। কিন্তু কিছু বলার নেই। মধ্যখানে কথা বলা যাবে না।

লোকটি গালি দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। গালি ছাড়া একটা কথাও মুখ দিয়ে বের করছে না। টানা দশ মিনিট মির্জার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে বসে পড়ল সে।

মির্জাপক্ষের মুনাজির উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এখানে আর মুনাজেরার কোনো পরিবেশ আছে বলে আমি মনে করতে পারছি না। এসেছিলাম আলেমদের সাথে বিতর্ক করতে। কিন্তু এতক্ষণ যে লোক দাঁড়িয়ে কথা বলল, সে আলেম নয়; তাতে আমাদের আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁকে আমি একজন ভদ্র এবং সুস্থ মস্তিস্কের মানুষই মনে করতে পারছি না। কোনো সভ্য মানুষ এভাবে গালিগালাজ করে না— বলেই বসে পড়ল সে।

লোকটি আবার উঠে দাঁড়াতে চাইল। মুসলমানরা তাঁকে ধরে বসালেন। বাবা যা বেইজ্জত করার করে ফেলেছিস। আর দরকার নেই। সে বলল, ‘আমাকে বলতেই হবে। সে আমার দলিলের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে। আমাকে আপত্তি খণ্ডন করতে হবে—’ বলেই জোর করে উঠে দাঁড়াল সে। মির্জায়ীদের উদ্দেশ্য বলল,

আমি মাত্র দশ মিনিট গালাগালি করলাম। আর তাতেই বলছ আমি কোনো সভ্য মানুষই না। আমি একজন ইতর শ্রেণির লোক!

‘অবশ্যই তুমি একটা ইতর।’

‘লজ্জা করা উচিত তোমাদের। দশ মিনিট গালি দেওয়ার কারণে আমি ইতর হয়ে গেলাম, আর যে লোক ৫০ বছর গালি দিয়ে গেল... তাও কাকে? আল্লাহর নবিগণকে, উম্মাহাতুল মুমিনিনকে, আল্লাহর নবির সাহাবাকে, সেই লোক তো আরও মহা ইতর এবং মহা অসভ্য হওয়ার কথা। তাহলে তেমন একটা মহা ইতরকে তোমরা তোমাদের নবি বলছ— লজ্জা করে না তোমাদের?’

মির্জায়ীরা থ হয়ে গেল।

আরেকটি মুনাজেরার কথা জানাই। যদিও কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু ইন্টারেস্টিং। এটিও দালিলিক মুনাজেরা ছিল না। বাটকা টাইপ ছিল। দলিল যেখানে শেষ, বাটকা সেখানে শুরু। ওই যে মজার একটা কবিতা আছে না—

চার কিতাবওয়া আরশা লান্তা পাঞ্জা লান্তা ডাণ্ডা
চার কিতাব যব কুচ না করতা ডাণ্ডা করতা ঠাণ্ডা।

আরশ থেকে চার চারটি কিতাব এসেছে। পাঁচ নম্বরে এসেছে ডাণ্ডা। চার কিতাব যখন মানুষকে ঠাণ্ডা করতে পারে না, তখন ডাণ্ডা ঠাণ্ডা করে দেয়। বলে রাখি এটি এ একটি ফান কবিতা। কেউ যেন আবার আকিদার মাসআলা ফিট করে ফতওয়া টুকে না দেন, প্লিজ।

খ্রিষ্টানদের সাথে মুনাজেরা হবে। তাদের দাবি হজরত ইসা ﷺ আল্লাহর পুত্র। মুসলমানদের দাবি, ইসা আল্লাহর একজন নবি। আল্লাহর যেমন মা-বাবা নেই, কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিতর্ক চলছে। দালিলিক দুনিয়ায় কেউ কাউকে বাগে আনতে পারছে না। মুসলমানদের গ্রুপে পেছন দিকে বসা এক বৃদ্ধ চাচা বার বার মুসলমান মুনাজিরের জামা ধরে টানছেন; ‘হুজুর! আমাকে একবার সুযোগ দিন। আমি কিছু কথা বলি।’

সঙ্গতকারণেই মুরবিবর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ছিল না। বাঘা বাঘা আলেমগণ কথা বলছেন। কথা হচ্ছে দলিলের ভিত্তিতে। তাতেই ওদের সাইজ করা যাচ্ছে না। আর গায়রে আলেম গ্রাম্য এক...

কিন্তু চাচামিয়া একটু পরপর পেছন থেকে গুতাগুতি এবং পাঞ্জাবি টেনে ধরা অব্যাহত রাখলেন। এক পর্যায়ে বলেই বসলেন, ‘আপনারা তো আপনাদের দলিল দিয়ে সকাল থেকেই চেষ্টা করছেন। কোনো কাজ কি হলো? তাহলে আমাকে ৫ মিনিট সময় দিলে অসুবিধা কী! দেখুন না এগুলোকে কেমনে সাইজে আনি। পুরো পাঁচ মিনিটও লাগবে না আমার।’

বিরক্ত হয়েই সুযোগ দেওয়া হল চাচাকে। বলা হলো, এবার আমাদের পক্ষ থেকে কথা বলবেন আমাদের এই চাচা মিয়া।’ প্রতিপক্ষ হাসাহাসি করতে লাগল। কেন খামাখা সময় নষ্ট করছেন? আপনাদের কাছে আর কোনো দলিল নেই, আপনারা পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন; সোজা-সাপ্টা বলে দিলেই হয়।

মুসলমান মুনাজির কথার জবাব দিতে যাবেন, কিন্তু তার আগেই চাচা মিয়া অবস্থান নিয়ে নিয়েছেন। শুরু করলেন তিনি-

‘দেখুন, সেই সকাল থেকে বসে বসে আপনাদের দলিল কপচা-কপচি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি! আর ভালো লাগছে না। আমি অনেকক্ষণ থেকেই কথা বলার সুযোগ চাচ্ছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমাকে আরও আগে সুযোগ দেওয়া হলে অনেক আগেই ফায়সালা হয়ে যেত। এতক্ষণে সবাই যার যার বাড়ি ফিরে যেতে পারতেন।’

চাচার শরীর থেকে কয়েকগুণ ভারি এই ভূমিকা শুনে সবাই নড়েচড়ে বসলেন। পুরো মজমার কৌতূহলের কেন্দ্রে এখন চাচাজি। চাচাজি বললেন,

‘আমি আমাদের ছজুর থেকে ৫ মিনিট সময় পেয়েছি। দুই মিনিট শেষ। আর মাত্র তিন মিনিট আছে। সমস্যা নেই। তিন মিনিটও লাগবে না আমার।’

তারপর খ্রিষ্টান বিতর্কিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাচা বললেন, ‘আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন করব। আশা করি সংক্ষেপে জবাব দেবেন। আমার হাতে সময় আছে আর আড়াই মিনিট।’

তারা বললেন, ‘বলুন কী জানতে চান!’

‘আল্লাহর জন্মদিনটা যেন কবে?’

‘হোয়াট?’

‘মানে আল্লাহ কবে জন্মগ্রহণ করেছেন?’

‘পাগল নাকি! আল্লাহ জন্মগ্রহণ করবেন মানে কী!’

‘কিন্তু আমার কথা আগে বাড়ানোর জন্য যে এটা জানা দরকার ছিল। সমস্যা নেই। বয়স জানলেই হবে। কত হতে পারে আল্লাহর বয়স?’

খ্রিষ্টান বিতর্কিক বললেন, ‘ও চাচা! প্লিজ আপনি বসুন। এখানে একটি সিরিয়াস বিষয়ে মুনাজেরা চলছে।’

চাচা বললেন, ‘আমিও তো তাই মনে করছি। দয়া করে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিন। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। আল্লাহর বয়স কত?’

‘আল্লাহ হলেন অনাদি-অনন্ত।’

‘কঠিন করে বলছেন কেন? আমি অশিক্ষিত মানুষ।’

‘আল্লাহর শুরু নেই শেষও নেই।’

‘তাহলে তো বয়সটাও জানা যাবে না। সমস্যা নেই। আমার কথা পরীক্ষার করার জন্য অনুমান করে একটা সংখ্যা ধরে নিলেই হবে। কত ধরা যায়? আচ্ছা ধরে নিলাম এক লাখ বছর। ঠিক আছে?’

‘ধরুন আপনার যা খুশি।’

‘এবার বলুন আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য কেমন?’

‘আল্লাহর শক্তি সামর্থ্য কেমন মানে? আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান।’

‘আপনাদের দাবি ইসা আল্লাহর পুত্র, তাই তো?’

‘ইয়েস।’

‘একাই?’

‘মানে কী?’

‘মানে আল্লাহর কি এই একজনই সন্তান, না আরও আছে?’

‘একজনই।’

‘ছেলেটা এখন কই?’

‘ইহুদিরা তাঁকে মেরে ফেলেছে।’

এবার চাচামিয়া স্বরূপে আসলেন। বললেন, ‘তাহলে আজ থেকে আপনারা আপনাদের এমন দুর্বল আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। আপনাদের এই আল্লাহ থেকে আমি সবদিক দিয়েই এগিয়ে।’

খ্রিষ্টান পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বলে কী এই বুড়া? চাচা বললেন, ‘আপনাদের আল্লাহ এতো শক্তিমান। বয়স আবার কমপক্ষে একলাখ বছর। এত শক্তি এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এতদিনে একটিমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পেরেছেন। সেই একমাত্র পুত্রকেও আবার দুশমনরা মেরে ফেলল, রক্ষাও করতে পারলেন না। আর এই আমাকে দেখেন। আমার বয়স পঁয়ষট্টি। এগারো ছেলে আমার। কেউ আমার একটা ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখুক, চোখ উপড়ে ফেলব।’

অডিয়েন্স তালিয়া বাজাতে লাগল।

মুনাজেরা সেখানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় শর্ত : নবিকে ইনসানে কামিল হতে হবে

নবি হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো নবিকে ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানুষ হতে হবে। অর্থাৎ নবি হবেন একজন পুরুষ। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا

‘হে নবি! আপনার আগে কোনো মহিলাকে আমি নবি বানাইনি।’

কোনো মহিলাকে নবুয়ত দান করা হয়নি। হিজড়াকে তো প্রশ্নই আসে না। মির্জা গোলাম কাদিয়ানির মধ্যে এই দুই গুণই ছিল। মির্জা নিজেকে মহিলাও বলেছে, আবার হিজড়াও। সে যখন মহিলা ছিল, তখন গর্ভবতীও হয়েছিল। কথাটি সে নিজেই জানিয়েছে। সে তার রুহানি খাজাইন, খণ্ড ১৯, ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছে,

براین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشوونما پاتا رہا پھر جب دو برس گزر گئی تو جیسا کہ براہین

احمدیہ حصہ چہارم صفہ ۴۹۶ میں درج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی
روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا
گیا

বারাহিনে আহমদিয়া তৃতীয় খণ্ডে আমার নাম মারইয়াম রাখা হলো। ঠিক যেমনটি ওখানে বলেছি, দুই বছর আমি মারইয়াম হিসেবে লালিত পালিত হলাম। দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, যেমনটি জানিয়েছি বারাহিনে আহমদিয়া চতুর্থ খণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠায়, মারইয়ামের মতো আমার মধ্যেও ইসার রুহ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং আমাকে গর্ভবতী বানিয়ে দেওয়া হলো...

তাহলে ম্যাসেজ পরিষ্কার, মির্জা মহিলাও ছিল। তাও শুধু নামে মহিলা না, কামেও। রীতিমতো গর্ভধারণও করেছিল। যথাসময়ে সন্তানও প্রসব করেছিল বলে সে অন্যত্র জানিয়েছে। সেই আলোচনা যথাস্থানেই হবে।

মির্জা এক পর্যায়ে পুরুষত্ব হারিয়ে হিজড়াও হয়ে গিয়েছিল। এই কথাটিও সে নিজেই জানিয়েছে। তারপর কীভাবে সে তার পুরুষত্ব ফিরে পেতে পারে— এ ব্যাপারে সে তার কোনো বন্ধুর সাথে কী শলা-পরামর্শ করেছিল এবং বন্ধু তাকে কী জবাব দিয়েছিল, আসব সেই আলোচনায়ও।

তাহলে মির্জা একজন পরিপূর্ণ পুরুষ ছিল না। কিছু সময় পুরুষ কিছু সময় নারী বলা যায় এবং এক পর্যায়ে না-মর্দও হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং কোনো ব্যাখ্যা দ্বারাই তাকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ বলা যায় না। আর নবি হওয়ার জন্য শর্ত হলো পরিপূর্ণ মানুষ বা ইনসানে কামিল হওয়া।

তৃতীয় শর্ত : নবিকে মাবউস মিনাল্লাহ হতে হবে

নবি যিনি হবেন তাঁকে মাবউস মিনাল্লাহ হতে হয়। অর্থাৎ কেউ নিজে নিজে নবি হতে পারেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নবি বানাতে হয়। নবি নিজেকে নবি ঘোষণা দেন না, আল্লাহ তাঁকে দিয়ে সেই ঘোষণা দেওয়ান।

আল্লাহর ঘোষণা আমরা জানব কীভাবে? কীভাবে বুঝব কাকে আল্লাহ নবি হিসেবে সিলেক্ট করেছেন— সেই আলোচনা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। আমরা এটা জানব মুজাজাতে নবুওয়তের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গকথা : নবিগণ যেহেতু সিলেকটেড বাই আল্লাহ হন, সে কারণে তাদের শতভাগ পারফেক্ট হতে হয়। ব্যক্তিজীবনেও নিষ্কলুষ হওয়া লাগে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যখন আল্লাহ নির্দেশে এলানে নবুয়ত করলেন, তখন প্রথমে নিজের চারিত্রিক দিক তুলে ধরে সাফাই দিলেন। বললেন,

‘আমি তোমাদের সাথে যুগ যুগ থেকে আছি। আমাকে তোমরা কেমন দেখলে? অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা? আমি মানুষটা আসলে কেমন?

সবাই একসাথে বলে উঠল, ‘হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। আমরা তোমাকে কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। কোনো অন্যায় করতে দেখিনি। তুমি একজন পারফেক্ট মানুষ।

তারা নবিজির চারিত্রিক সাফাই দেওয়ার পর নবিজি বললেন, কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তুফলিহ্ন। তাহলে স্বীকার করে নাও আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সফল হতে পারবে।’

আবু লাহাব আঙুল তুলে ধমক দিয়ে উঠল; ‘তাব্বান লাকা ইয়া মুহাম্মাদ, আলিহাজা জামাতানা?’ মুহাম্মাদ তুমি ধ্বংস হও! এ জন্যই কি আমাদের জড়ো করেছিলে? এসব কথা বলার জন্যে? নবিজি আবু লাহাবের কথার জবাব দিলেন না, সহ্য করে নিলেন। কিন্তু আল্লাহ সহ্য করলেন না। আল্লাহ জবাব দিলেন। বললেন, ‘তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব।’ আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক। তার কত বড়ো সাহস! আমার নবির দিকে আঙুল উচিয়ে কথা বলে।

যে যার প্রতিনিধি, সেই তাকে রক্ষা করে। কেউ যদি কাউকে কোথাও প্রতিনিধি হিসেবে পাঠায় আর সেখানে গিয়ে সে অপমানিত হয় বা বিপদে পড়ে, তাহলে যে পাঠিয়েছে সেই এগিয়ে আসে। সাহায্য করে। প্রতিবাদ করে।

আবু লাহাব নবির সাথে বেয়াদবি করল। আল্লাহ জবাব দিলেন, কারণ মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রতিনিধি। কারণ, তিনি শুধু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছিলেন না, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও ছিলেন।

নবিজির ছেলের ইন্তেকাল হলে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল, সব শেষ। মুহাম্মাদের ছেলে মারা গেছে। সে এখন নিঃবংশ। ‘ইন্না মুহাম্মাদান হুয়াল আবতার। আবতার শব্দের শাব্দিক অর্থ লেজকাটা বা লেজ হীন। ইংরেজিতে Tailless. কারও ছেলে সন্তান না থাকলে আরবের লোকেরা তাকে ‘আবতার’ বলে ছোটো করত।

মক্কার মুশরিকদের কথায় নবি কষ্ট পেলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। আল্লাহ জবাব দিলেন। কারণ, নবি আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ বললেন, নবি আপনি মন খারাপ করবেন না। আপনাকে আমি কাওসার দান করলাম। আপনি এখন আপনার রবের জন্য নামাজ পড়ুন আর কুরবানি করুন। (আর ওরা আপনাকে আবতার বলেছে, না? আমি আল্লাহ বলছি) ‘ইন্না শা-নিআকা হুয়াল আবতার’, আপনার শত্রুরাই লেজকাটা, নিঃবংশ।

আম্মিজন আয়েশার ওপর অপবাদ উঠল। মদিনার মুনাফিকরা আয়েশার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠাল। নবি প্রতিবাদ করলেন না। কারণ, নবি আল্লাহর প্রতিনিধি। নবির স্ত্রীগণ আল্লাহ কর্তৃক বাছাইকৃত। এ জন্যই নবির স্ত্রীর হয়ে জবাব দিলেন স্বয়ং আল্লাহ- ‘সুবহানাকা হাজা বুহতানুন আজিম’ বলে। বললেন, মহাপবিত্র আল্লাহ জানাচ্ছেন আয়েশার ওপর এটি একটি জঘন্য অপবাদ।

এটাই কারণ, মির্জা গোলাম কাদিয়ানির কুফরির বিরুদ্ধে ওলামায়ে ইসলাম যখন স্বেচ্ছায় হয়েছিলেন, মির্জার যুগে, তখন উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদি ইংরেজদের রাজ ছিল। ইংরেজরা তাকে নিরাপত্তা দিত। তারা মির্জার পক্ষে দাঁড়াত। কারণ, মির্জা ছিল তাদের প্রডাক্ট। যে যার প্রতিনিধি, সেই তাকে ডিফেন্স করে।

আমি্রে শরিয়ত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারিসহ খতমে নবুয়ত আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ওলামায়ে কেরামকে মির্জার বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে বারবার জেলে যেতে হচ্ছিল। একবার একজন আমি্রে শরিয়তকে ‘জীবন কেমন কাটছে’ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, ‘কুচ রেলমে কুচ জেলমে।’

মির্জার বিরুদ্ধে কথা বললে তার পক্ষে ইংরেজ সরকার দাঁড়িয়ে যায় কেন? কেউ একজন আতাউল্লাহ বুখারিকে জিজ্ঞেস করলে শাহ সাহেব বলেছিলেন, যে যার প্রতিনিধিত্ব করে, সমস্যা পড়লে সেই এগিয়ে আসে। নবিগণকে আল্লাহ পাঠান। তাই নবিগণ বিপদে পড়লে আল্লাহ তাদের পাশে দাঁড়ান। মির্জাকে নবি (!) বানিয়ে মাঠে ছেড়েছে ইংরেজরা। সুতরাং তার পক্ষে তারাই দাঁড়াবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

মোটকথা নবিগণ মাবউস মিনাল্লাহ হয়ে থাকেন। মির্জা গোলাম কাদিয়ানি ছিল মাবউস মিনাল ইংরেজ। সুতরাং সে মানুষ হোক, অমানুষ হোক, অথবা নর্দমার কীটসহ আর যাই হোক, নবি হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না।

চতুর্থ শর্ত : নবিগণ হবেন মাসুম আনিল খাতা

নবিগণের আরেকটি গুণ হলো তাঁদের মাসুম আনিল খাতা হতে হয়। মাসুম আনিল খাতা মানে গুনাহ থেকে পবিত্র। আল্লাহর কোনো নবিই কোনো গুনাহ করেননি। যেমন নবুয়ত প্রাপ্তির আগে, তেমন নবি হওয়ার পরেও।

মাসুম নিয়ে দু-একটি কথা আলাদাভাবে বলা দরকার। মাসুম মানে এই না যে তিনি গুনাহ করেন না। মাসুম মানে হলো আল্লাহপাক তাঁর থেকে কোনো গুনাহ হতে দেন না। মাসুম ইসমে মাফউলের সেগা। ইসমে ফাইলের নয়। কথাটি মাদরাসা ছাত্ররা বোঝবে। সাধারণ মুসলমান না বুঝলেও সমস্যা নেই।

নবিগণের যাবতীয় কথা ও কাজ হতো দু-ধরনের

এক. আল্লাহ থেকে প্রত্যাশিত হয়ে।

দুই. নিজে ইজতেহাদ করে।

নবিগণের ইজতেহাদ মানে যেসব ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনা নেই, এবং কাজটির সাথে দ্বীনের সরাসরি কোনো সম্পর্কও নেই, সেসব ব্যাপারে নিজে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত দেওয়া বা কাজ করা। আর নবিগণের সব ইজতেহাদ সব সময় শতভাগ সঠিক না হলেও সেটাকে গুনাহ বলা হয় না। নবিগণের পার্সোনাল অনেক কথা বা কাজ তাদের অবস্থান থেকে সঠিক থাকলেও সবগুলো সব সময় আল্লাহর দৃষ্টিতে পারফেক্ট না-ও হতে পারে। এর মানে এই না যে, সেগুলো ভুল ছিল। তারা ভুল ছিলেন।

আল্লাহপাক নবিজির পুরো জীবনের কসম করে বলেন, লাআমরু'ক, নবি আপনার জীবনের কসম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলিমুল গাইব। মা কান ওয়ামা ইয়াকুন, অর্থাৎ যা ঘটেছে আর যা ঘটবে— সব জানেন। নবির জীবনের কোনো অংশেও যদি ছোটোখাটো গুনাহ থাকত, তাহলে আল্লাহ নবির জীবনের কসম করতেন না।

মুশরিকিনে মক্কা নবিজিকে ভালোমন্দ বলতে কম বলেনি। কবি বলেছে। পাগল বলেছে। এই বলেছে, সেই বলেছে। কিন্তু তেষটি বছরের জীবনের কোনো একটি বাঁকেও নবিজি কোনো একটি অন্যায় বা গুনাহর কাজ করেছেন— কেউ বলতে পারেনি।

অন্যদিকে মির্জা গোলাম কাদিয়ানি ছিল গুনাহর কারখানা। এমন গুনাহ খুব কমই আছে যা সে করেনি। এটা প্রমাণ করার জন্য বাইরে যাওয়া লাগে না। খোদ মির্জার নিজের লেখা কিতাবাদিই যথেষ্ট। কাদিয়ানিরা আপত্তি উঠালে তাদের ভাষায় বলা যায়, তোমাদের নবি যে গুনাহর ফ্যাক্টরি ছিল, এটা তোমাদের নবির হাদিস থেকেই প্রমাণিত। আর মির্জা যদি তোমাদের কাছে নবি হয়ে থাকে, তাহলে তার কথাবার্তা তো তোমাদের কাছে হাদিসই হওয়ার কথা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি মুনাজেরার কথা বলি। পাকিস্তানে একবার কাদিয়ানি ভার্চুয়াল মুসলমান মুনাজেরা চলছে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে ঠিক করা হয়েছে দলিল হিসেবে শুধু কুরআন এবং হাদিস উপস্থাপিত হবে। কুরআন-হাদিস ছাড়া আর কোনো কিতাব উপস্থাপন করা যাবে না।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোনোভাবেই তাদের সাইজে আনা যাচ্ছে না। মির্জা গোলাম কাদিয়ানির যাবতীয় আমলনামা এবং আকিদা তো তার কিতাবাদিতে লেখা। কিন্তু শর্ত মোতাবেক সেগুলোকে দলিল হিসেবে তুলে ধরা যাচ্ছে না। মুসলমান মুনাজিরগণ দেখলেন এই অবস্থায় একজনই আছেন, যিনি এদের কাবু করতে পারবেন। আল্লামা খালেদ মাহমুদ।

নিয়ে আসা হলো তাঁকে। মির্জায়ীরা বলল, ‘জনাব, মুনাজেরার শর্তগুলো ভালো করে পড়েছেন তো?’

তিনি বললেন, ‘জি।

‘দলিল কিন্তু শুধু কুরআন এবং হাদিস।’

‘আচ্ছা।’

‘তাহলে শুরু করুন।’

আল্লামা খালেদ মাহমুদ মির্জা গোলাম কাদিয়ানির লেখা একটা কিতাব হাতে নিলেন।
কাদিয়ানিরা বলল,

‘কী বের করেছেন?’

‘কিতাব। দলিল দিতে হবে না!’

‘এটি কোন কিতাব?’

‘এটি মির্জা সাহেবের লেখা একটা কিতাব।’

‘আপনি শর্ত ভুলে যাচ্ছেন হজরত। কুরআন হাদিস ছাড়া আর কোনো কিতাবকে রেফারেন্স হিসেবে পেশ করা যাবে না।’

আল্লামা খালেদ মাহমুদ বললেন, ‘আমি আমার জীবনে অনেক বেকুব দেখেছি কিন্তু তোমাদের মতো বেকুব আগে দেখিনি।’

কাদিয়ানি বিতর্কিকরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা বুঝতে পারছে না কিছুই।
আল্লামা খালেদ মাহমুদ বললেন,

‘হাদিস কাকে বলে এটাই জানো না আর চলে এসেছ হাদিস নিয়ে মুনাযেরা করতে।’

‘তারা বলল, হাদিস কাকে বলে এটা জানব না কেন! নবির কথা ও কাজকে হাদিস বলে।’

আল্লামা খালিদ মাহমুদ হাসছেন।

তারা বলল, ‘হাসছেন কেন? এখানে হাসির কী হলো?’

তিনি বললেন, ‘একটু আগে বলেছিলাম তোমাদের মতো বেকুব আমি আগে কখনো দেখিনি। এখন মনে হচ্ছে ভবিষ্যতেও দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমাদের দাবি মির্জা গোলাম কাদিয়ানি নবি ছিল। আর তোমরা তার উম্মত। তোমরা এখানে এসেছ তাকে নবি প্রমাণের জন্য মুনাযেরা করতে। অথচ, তোমরাই বলছ সে নবি ছিল না!’

‘বুঝলাম না আপনার কথা!’

‘তোমরাই স্বীকার করলে নবির কথা ও কাজকে হাদিস বলে। অথচ আমি যখন তোমাদের নবির কথা এবং কাজ থেকে রেফারেন্স দেওয়ার জন্য তার কিতাব বের করলাম, তোমরা প্রতিবাদ করলে। বললে, এই কিতাব থেকে রেফারেন্স দেওয়া যাবে না।’

‘কেন যাবে না?’

তার মানে, এটা হাদিসের কিতাব নয়।

তার মানে, মির্জার কথা ও কাজ হাদিস নয়।

কিন্তু তোমরাই আবার স্বীকার করেছ নবির কথা ও কাজকে হাদিস বলে। তার মানে মির্জা গোলাম কাদিয়ানি যে নবি ছিল না, এটা প্রমাণ করার কষ্টটা আর আমাদের করতে হচ্ছে না। তোমরাই করে ফেলেছ। থ্যাংক ইউ গাইজ।’

মুসলমানরা স্লোগান দিতে দিতে বিজয় মিছিল নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর কাদিয়ানির দোসররা বসে রইল গালে হাত দিয়ে। কী থেকে কী হয়ে গেল! এভাবে ধরা খেতে হবে— তারা ভাবতেই পারেনি।

পঞ্চম শর্ত : নবিদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে হবে

নবিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। কারণ সেগুলো হয় আল্লাহর ইশারায়। বদরের যুদ্ধের আগের দিন নবিজি যেখানে যেখানে যে কাফির নেতার লাশ পড়ে থাকবে বলে জানিয়েছিলেন, পরের দিন ঠিক সেখানে সেখানেই তাদের লাশগুলো দৃশ্যমান হয়েছিল।

আর মির্জা গোলাম! বেইমানটা সারা জীবন যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, একটাও সত্য হয়নি। সেগুলো বিস্তারিত পরে আলোচনায় আসছে।

তাহলে কথা দাঁড়াল এই, নবি হতে হলে অপরিহার্য কিছু গুণ থাকতে হয়। সব নবিগণের মধ্যেই ছিল। ছিল না শুধু মির্জা গোলাম কাদিয়ানির। থাকার কারণও ছিল না। এগুলো নবিগণের গুণ, কোনো ভণ্ডের নয়।

সর্বালমে খতমে নবুয়ত

বড়ো আলম বা জগৎ হলো চারটি। মোটামুটি প্রত্যেক মানুষকেই এই চার জগৎ সফর করতে হচ্ছে এবং হবে। সেগুলো হলো,

১. আলমে আরওয়াহ বা আত্মার জগৎ।
২. আলমে দুনিয়া বা ইহজগৎ।
৩. আলমে বারজাখ বা কবরজগৎ।
৪. আলমে আখিরাহ বা কিয়ামতজগৎ।

চার জগতেই একচ্ছত্র আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, চার জগতে আল্লাহপাক যেভাবে তাঁর একত্ববাদের সবক দিয়েছেন, একইসাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালত তথা খতমে নবুওয়তেরও সবক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

আত্মার জগৎ

আত্মার জগতে আল্লাহপাক ‘আলাসতু বিরাব্বিকুম’র মাধ্যমে যেমন একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং আল্লাহর রবুবিয়তের ওয়াদা নিয়েছেন, একইভাবে মানবজাতির মধ্যে ভিভিআইপি ক্যাটাগরির মানুষ সোয়া লাখ নবি-রাসূল থেকে ‘ওয়া ইজ আখাজাল্লাহ মিসাকান-নাবিয়্যিন’র মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর খতমে নবুওয়তের প্রতি ইমানেরও ওয়াদা নিয়েছেন।

আলাসতু বিরাব্বিকুমের মাধ্যমে আল্লাহর তাওহিদের স্বীকরোক্তির ব্যাপারটা মোটামুটি সকল মুসলমানই কমবেশি জানে। তবে নবিজির নবুওয়তের স্বীকারোক্তির ব্যাপারটি সম্ভবত অনেকেই সেভাবে জানে না। এই অংশটি নিয়ে একটু বলা দরকার।

সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৮১, আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

‘(স্মরণ করো সেদিনের কথা) যখন আল্লাহ নবিগণ থেকে অঙ্গীকার নিলেন (এভাবে), তোমাদের আমি কিতাব ও হিকমাহ দেব। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার একজন রাসূল যাবেন, তোমাদের সত্যায়িত করবেন, (তোমাদেরকে ওয়াদা করতে হবে) তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তোমরা কি এটা মেনে নিচ্ছ এবং অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে? সবাই বললেন, আমরা মেনে নিলাম। আল্লাহ বললেন, তাহলে সবাই সাক্ষি থেক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষি হয়ে থাকলাম।’

আশা করি বোঝানো গেল আত্মার জগতে আল্লাহর একত্ববাদের সবক যেমন ছিল, নবির নবুওয়তের সবকও ছিল। তাও আবার আম পাবলিকের মজমায় নয়, ভিভিআইপি ক্যাটাগরি-নবিগণের মাহফিলে।

আলমে দুনিয়া

আলমে দুনিয়ায় যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, একই সাথে নবিজির নবুয়ত তথা খতমে নবুওয়তের ভুরি ভুরি দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ যেমন নিজের জন্য রাব্বিল আলামিন বলেছেন, তেমনি নবিজির জন্য রাহমাতাল্লিল আলামিনও বলেছেন। এক তাফসির অনুযায়ী এখানে রাহমাত মানে নবুয়ত।

হাদিস শরিফে উদাহরণের অভাব নেই। একটা হাদিস সামনে নিয়ে আসি। আল মুজামুস সাগির লিত-তাবরানি দ্বিতীয় খণ্ডে হজরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস,

একলোক নবিজির সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে ছোট্ট একটি পুটলি। বলল, আপনি কি আল্লাহর নবি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাকেই আল্লাহর নবি বলা হয়। সে বলল, আমার হাতের পুটলিতে ছোট্ট একটি প্রাণী আছে। সে যদি আপনাকে নবি হিসেবে সাক্ষ দেয়, তাহলে আমিও আপনাকে নবি বলে স্বীকার করে নেব।

গ্রাম্য লোকটির হাতের পুটলিতে ছিল একটি গুইসাপ। নবিজি সাপটিকে প্রশ্ন করছিলেন আর সে জবাব দিচ্ছিল। উমর বলেন, গুইটি এত স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলছিল যে, আমরা তার প্রতিটি শব্দ শুনতে এবং বুঝতে পারছিলাম।

নবিজি বললেন, হে ণুই!

সে বলল, ওগো মহিমাম্বিত নবি। আমি আপনাকে শুনছি।

নবিজি বললেন, তুই কার ইবাদত করিস?

সে তাওহিদের ওপর তার ভাষণ শুরু করল। ছোট্ট একটি প্রাণি যে ভাষণটি সেদিন দিয়েছিল, আজকের দিনে মাখামোটাদের জন্য সেটি একটি দিকনির্দেশনা হতে পারে। সে শুধু নবিজির নবুওয়তের ব্যাপারেই কথা বলেনি, এই সময়ের; অর্থাৎ একুশ শতকের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বড়ো দুটি সমস্যা ‘খতমে নবুওয়তের আকিদা’ এবং ‘গণতান্ত্রিক বিশ্বাস’ সংক্রান্ত বিভ্রান্তির নিরসনকল্পে তার অবস্থান ক্লিয়ার করার পাশাপাশি দিকনির্দেশনাও দিয়েছিল। তাওহিদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে সে বলেছিল,

الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ،

وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ،

আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি-

আল্লাজি ফিস সামাই আরশুহ : আসমানে যার আরশ।

ওয়াফিল আরদি সুলতানুহ : জমিনে যার রাজত্ব।

ওয়াফিল বাহরি সাবিলুহ : যিনি সাগরে রাস্তা তৈরি করেন।

ওয়াফিল জান্নাতি রাহমাতুহ : যিনি খুশি হলে জান্নাত দিয়ে দেন।

ওয়াফিন-নারি আজাবুহ : আর রাগ করলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন।

পয়েন্ট টু বি নোটেড

ওয়াফিল আরদি সুলতানুহ। জমিনে যার রাজত্ব। ণুই’র দেওয়া গণতান্ত্রিক টিপ, রাজত্ব আল্লাহর। ক্ষমতার উৎসও তিনি। মানুষ কখনো সার্বভৌমত্বের মালিক এবং ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। ছোট্ট একটি জম্বুর কাছেও যে বিষয়টি পরিষ্কার ছিল, আজকাল আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি করেও সেটা বুঝতে পারি না!

নবিজি বললেন, ‘আচ্ছা আমার ব্যাপারে তোর কি কোনো ধারণা আছে? অর্থাৎ আমি কে? মান আনা?’

সে বলল, ‘ওগো নবিজি, আপনাকে চিনব না কেন!

أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

আপনি হলেন বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল এবং...’

... এবং তার পরের কথাটিই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য। সে শুধু ‘আনতা রাসূলু রাব্বিল আলামিন বা আপনি আল্লাহর রাসূল’ বলেই কথা শেষ করেনি। সাথে সাথে তার আকিদাও স্পষ্ট করে দিলো। বলল, ‘আনতা রাসূলু রাব্বিল আ’লামিনা ওয়া খাতামুন নাবিয়্যিন’। আপনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি।

তারপর সে অজিজাসিত একটি প্রশ্নেরও জবাব দিয়ে দিলো। প্রশ্নটি হতে পারত এমন, কেউ যদি নবিজিকে ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ হিসেবে মেনে না নেয় তাহলে সমস্যা কী? ছোট্ট প্রশ্নটি সেটারও আগাম জবাব দিয়ে রাখলো। সে বলল,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ

‘ক্বাদ আফলাহা মান সাদ্দাক্বাক, যে আপনাকে মেনে নেবে সেই সফল হবে। ‘ওয়াক্বাদ খা-বা মান কাজ্জাবাক’, আর যে আপনাকে মানবে না সে বিফল বা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পয়েন্ট অব ভিউ

ভূমিকায় বলেছিলাম খতমে নবুওয়তের আকিদাটি এমন এক আকিদা, যা শুধু মানুষ এবং মানবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না, কীট-পতঙ্গ তথা জানুয়ারেরাও খতমে নবুওয়তের আকিদার কথা জানে এবং স্বীকার করে। সুতরাং একথা বলাই যায়, কেউ যদি খতমে নবুওয়তের আকিদায় বিশ্বাস করে না, তাহলে সে জংলি জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট; পশুরচেয়েও পশু।

আলমে বারজাখ

তৃতীয় জগৎ আলমে বারজাখ বা কবরজগৎ। সেখানেও আল্লাহর তাওহিদের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে নবিজির খতমে নবুয়তও আছে। কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। প্রথম প্রশ্ন আল্লাহকে নিয়ে। দ্বিতীয় প্রশ্ন নবিসংক্রান্ত। তৃতীয় প্রশ্ন দ্বীনসংক্রান্ত। প্রশ্ন তিনটির ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে প্রশ্নের স্ট্রাকচার কী হবে, সেটা নিয়ে বর্ণনায় একটু ভিন্নতাও আছে। যদিও সবগুলোর সারাংশ এক।

সাইয়্যিদুনা তামিম দারি (রা.) থেকে বর্ণিত, কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে, মান-রাব্বুকা- তোমার রব কে? তখন মুমিন বলবে, রাব্বি আল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারিকালাহ। আল্লাহ আমার রব, তাঁর সাথে আর কোনো শরিক নেই।

প্রশ্ন হবে, মান নাবিয়্যুক- তোমার নবি কে? মুমিন তখন বলবে, নাবিয়্যি মুহাম্মাদ ﷺ খাতামুন নাবিয়্যিন। আমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ, যিনি শেষ নবিও।

তাহলে কবর জগতে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে সাথে নবিজির শুধু নবুয়তই না, খতমে নবুয়তও থাকছে।

আলমে আখিরাত

সোয়ালখ নবি-রাসূলের মধ্যে ২৫ জনের কথা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে সরাসরি কুরআনে কারিমে বিবৃত হয়েছে। হাদিস শরিফ থেকে আরও কিছু নবির নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৫ জনকে একটু আলাদা করে উপস্থাপন করা যায়। তাঁরা হলেন—

হজরত আদম ﷺ

হজরত নুহ ﷺ

হজরত ইবরাহিম ﷺ

হজরত মুসা ﷺ

হজরত ইসা ﷺ

সহিহ বুখারিতে হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের আলোকে কিয়ামতের দিনের চিত্রটি তুলে ধরছি।

মানুষ ছুটে যাবে হজরত আদম ﷺ-এর কাছে। বাবা! আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করুন; বিচারটা যাতে শুরু করেন। আদম বলবেন, আমার একটু সমস্যা আছে। গন্দম খাওয়াসংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আমি একটু ভয়ে আছি। যদি আল্লাহ প্রশ্ন করে বসেন? তোমরা এক কাজ করো। নুহ'র কাছে যাও।

সবাই ছুটেবে নুহ ﷺ-এর দিকে। তিনি বলবেন, আমার একটু সমস্যা আছে। আল্লাহপাক আমাকে নিষেধ করেছিলেন, যেন কোনো কাফিরের জন্য দুআ না করি, কিন্তু আমি আমার কাফির ছেলে কেনানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে ফেলেছিলাম। আজ যদি বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ প্রশ্ন করেন, তাহলে কী জবাব দেবো! তোমরা বরং ইবরাহিম ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খলিল।

লোকজন ছুটে যাবে ইবরাহিম ﷺ-এর কাছে। তিনি বলবেন, এই কাজ আমি করতে পারব না। আমি আমার জীবনে তিনবার মিথ্যা বলেছিলাম। সেটা নিয়েই চিন্তায় আছি। কী জবাব দেবো! তোমরা এক কাজ করো। হজরত মুসা ﷺ-এর কাছে যাও। (বলে রাখা দরকার, ইবরাহিম ﷺ জীবনেও মিথ্যা বলেননি। তিনটি কথাতে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল মিথ্যা, তাই তিনি এভাবে বলবেন।)

মুসা ﷺ-এর কাছে যাওয়ার পর তিনি বলবেন, আমারও একটু সমস্যা আছে। একবার আমি একজনকে একটি চড় মেরে হত্যা করেছিলাম। তাকে মেরে ফেলার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু আমার এক চড়ে সে মরে যাবে- এটা আমি জানতাম নাকি? আল্লাহ যদি আজ ধরে ফেলেন তাহলে কী জবাব দেবো! তোমরা হজরত ইসার কাছে যাও।

সবাই যাবে ইসা ﷺ-এর কাছে। তিনি বলবেন, এই কাজ আমার দ্বারাও সম্ভব না। আজ একজনই আল্লাহর সামনে মুখ খোলার সাহস রাখেন। তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আজ একমাত্র তিনিই পারেন আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

মানুষ ছুটে যাবে নবিজির কাছে। গিয়ে বলবে, ওগো নবি! আল্লাহর কাছে একটু বলেন না, বিচারটা যেন শুরু করেন। আর পারছি না। তাদের ভাষাটা হবে এমন—

يا محمد انت رسول الله وخاتم الأنبياء

قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك

‘হে মুহাম্মাদ! আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুল আশিয়া। আল্লাহপাক আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনার কোনো দুর্বলতা নেই। আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করেন, যেন বিচারটা শুরু করা হয়।

নবিজি বলবেন হ্যাঁ, এটা আমারই কাজ।

আজ এই কাজ আমাকেই করতে হবে।

নবিজি আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকবেন। আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকবেন। এমনভাবে প্রশংসা করবেন যে, এর আগে কখনো এভাবে আল্লাহর প্রশংসা করেননি।

আল্লাহ খুশি হবেন। বলবেন, নবি, মাথা ওঠাও। বলো কী চাও তুমি? আজ তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই দেওয়া হবে। সুপারিশ করতে চাইলে করতে পারো। যার জন্য সুপারিশ করবে, সেটাই গ্রহণ করা হবে...

... শুরু হবে হাশরের বিচার।

তাহলে বোঝা গেল বড়ো যে চার জগৎ আছে, সবখানেই আল্লাহপাক যেমন তাঁর তাওহিদের চিহ্ন রেখেছেন, ঠিক তেমনি নবিজির রিসালাতের চিহ্নও দিয়ে রেখেছেন। আর এজন্যই আমরা দেখতে পাই, কুরআনে কারিমে আল্লাহপাক তাঁর তাওহিদ বর্ণনা করার জন্য যে তরজ তথা স্টাইল এখতিয়ার করেছেন, ঠিক একই স্টাইল তাঁর বন্ধুর রিসালাতের জন্যও ব্যবহার করেছেন।

নিজের জন্য বলেছেন— রাব্বিল আলামিন, নবির জন্য বলেছেন রাহমাতাল্লিল আলামিন। নিজেকে বলেছেন— রাব্বিন নাস, বন্ধুর জন্য বলেছেন কা-ফ-ফা-তাল-লিন-নাস। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, যেখানে যেখানে আমি আল্লাহর রবুবিয়াত সেখানে সেখানেই আমার বন্ধুর নবুয়ত। আমি যেখানকার আল্লাহ, আমার বন্ধুও সেখানকার নবি। আর আমি খোদার খোদায়ির বাইরে যেমন একচিলতে জায়গাও নেই, একজন মানুষও নেই, ঠিক তেমনি আমার বন্ধু মুহাম্মাদের নবুওয়তের বাইরেও কিছু নেই, কেউ নেই।

যুগে যুগে নবুওয়তের দাবি

এমন না যে, মির্জা কাদিয়ানিই শুধু মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করেছিল। এই বাটপারিটা আরও অনেকেই করেছে। করার কথাও ছিল। নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী তো আর মিথ্যা হতে পারে না। সুনানে তিরমিজি ২য় খণ্ড ৪৫ পৃষ্ঠা, সুনানে আবুদাউদ ২য় খণ্ড ১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিস, নবিজি ﷺ বলেছেন—

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ

‘আমার পরে উম্মতের মধ্যে ত্রিশজনের মতো দাজ্জাল-বেইমানের জন্ম হবে, যারা নিজেদের নবি দাবি করবে, অথচ আমি হলাম শেষ নবি। আমার পরে আর নতুন কোনো নবি আসার সম্ভাবনা নেই।’

এখানে ত্রিশ বলে নবিজি একটা সংখ্যা বুঝিয়েছেন। সুনির্দিষ্ট ত্রিশই হতে হবে-এটা উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য জরুরি না যে, কাটায় কাটায় ত্রিশই হতে হবে। এমনটাই ব্যাখ্যা করেছেন নির্ভরযোগ্য হাদিসশাস্ত্রবিদগণ। অবশ্য ত্রিশ হলেও সমস্যা নেই।

ইসলামের ইতিহাস খুঁজলে নবুওয়তের দাবিদার ভণ্ডদের নামের লম্বা একটা তালিকা পাওয়া যায়। যাদের কেউ কেউ নবিজির জীবদ্দশায়ই নবুওয়তের দাবি করেছিল। এমন কয়েকটি খান্নাসের কথা জানা যাক।

নবি যুগে সানাআয়ে ইয়ামানে ‘আসওয়াদ আনাসি’ নামে এক খবিস নিজেকে নবি দাবি করে বসল। সে ঘোষণা করল, মুহাম্মাদ হলেন মক্কা মদিনার নবি আর আমি ইয়েমেনের। দশম হিজরির কথা। নবিজি তখন পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন। নবিজি তখন জীবনের বেলাভূমিতে। আসওয়াদ আনাসির খবর শুনে নবি দারুণভাবে মর্মান্বিত হলেন। ইয়েমেনের মুসলমানদের কাছে হুকুম পাঠালেন যেকোনো কৌশলেই হোক, এই ফিতনা সূচনাতেই দাফন করে দাও। ইয়েমেনের গভর্নর হজরত মায়াজ বিন জাবাল মুসলমানদের সমবেত করে আসওয়াদ আনাসির ব্যাপারে নবিজির ফরমান পড়ে শোনালেন।

ইয়েমেনের প্রবল প্রতাপশালী মুসলিম শাসক বাযান ইন্তেকাল করায় তাঁর ছেলে ‘শাহর’ ইয়েমেনের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। আসওয়াদ আনাসি তাঁর ভক্ত-বাহিনী নিয়ে ইয়েমেনের রাজধানী সানআ আক্রমণ করে শাহরসহ সবাইকে হত্যা করে রাজপ্রাসাদ দখল করে নেয় এবং শাহরের সুন্দরী স্ত্রী আজাদকে হত্যা না করে শয্যাশায়িনী বানিয়ে ফেলে।

নবিজির চিঠি পেয়ে মুসলমানরা প্রতিজ্ঞা করলেন আসওয়াদকে আর মানুষের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দেওয়া হবে না! পরিকল্পনা ঠিক করা হলো। সাবেক শাসক শাহরের স্ত্রী আজাদ, যাকে ভণ্টা জোর করে রক্ষিতা বানিয়ে রেখেছিল, সেই মহিলার সহযোগিতায় আল্লাহর নবির সাহাবি হজরত ফিরোজ দালাইলামি শয়তান আনাসিকে হত্যা করে তার হাতে জাহান্নামের টিকেট ধরিয়ে দিলেন।

নবির দুশমন আনাসিকে হত্যার খুশির সংবাদটি নবিজির কাছে পৌঁছানোর জন্য মদিনায় দূত পাঠানো হলো। কিন্তু দূত মদিনায় গিয়ে পৌঁছানোর আগের দিনই নবিজি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তবে আল্লাহপাক তাঁর নবিকে ওহির মাধ্যমে এই শুভ সংবাদটি সাথে সাথেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। ইত্তিকালের আগে নবিজির চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোনো খুশির খবর?’ ইবনুল আসির জাযারি লিখেছেন—

قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين،

قیل: ومن هو؟ قال: فيروز، فاز فيروز

‘নবিজি বললেন, গতরাতে আসওয়াদ আনাসি নিহত হয়েছে। রাজপরিবারের এক

দুঃসাহসী যুবক তাকে হত্যা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ‘কে সেই যুবক?’

নবিজি বললেন, ফিরোজ। ফিরোজ সফল হয়েছে।’ (আল-কামিল ফিত তারিখ : ১/৩৬৫)

নবির জীবদ্দশায় ইয়ামামা থেকে ‘মুসায়লামা কাজ্জাব’ নামের খবিসটাও নবুয়ত দাবি করল। মুসলমানদের কাছে মুসায়লামা বেশ কুপরিচিত একটি নাম। কারণ, তার নামের সাথে কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী খেতাবটা স্বয়ং নবিজিই জুড়ে দিয়েছিলেন। একই সময়ে ‘সাজ্জাহ’ নামে এক মহিলারও শখ হলো নবিনী হওয়ার। সেও নিজেকে নবি ঘোষণা করে বসল। মুসায়লামা আর সাজ্জাহকে একত্র করে ফেললাম কারণ, একসময় ভণ্টা আর ভণ্ডি মিলে পরস্পর বিয়ে করে ফেলেছিল। সেই কাহিনিও ছিল বেশ মজার।

মহিলার নাম সাজ্জাহ। সাজ্জাহ বিনতে খুয়াইলিদ। সে নিজেকে নবিনী ঘোষণা করল। মুসায়লামা নামের একজন পুরুষ যদি নিজেকে নবি দাবি করে হালুয়া-রুটির বন্দোবস্ত করতে পারে, তাহলে আমি কেন পারব না। মহিলা হয়েছি বলে আমার কি নবি হওয়ার সাধ থাকতে পারে না! সুতরাং, আজ থেকে আমিও নবিনী। মজার ব্যাপার হলো, সে নিজেকে নবিনী ঘোষণা করার এক সপ্তাহের মধ্যে হাজার দশেক উম্মতও জুটিয়ে ফেলল।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তুমি যে নিজেকে নবিনী দাবি করছ, তোমার নবুওয়তের দলিল কী?’ সে বলল, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, “আনা খাতামুন নাবিয়্যিন, লা নাবিয়্যা বাদি।” আমি শেষ নবি, আমার পরে আর নতুন কোনো নবি আসবে না। কিন্তু, “লা নাবিয়্যা তা বাদি” বলেননি। তিনি তো আর বলেননি, আমার পরে আর কোনো নবিনী আসবেন না। সুতরাং আমার সুযোগ আছে।’

খবর পৌঁছাল মুসায়লামার কাছে। সে চিন্তায় পড়ে গেল... একজন মহিলাও যদি দোকান খুলে বসে, তাহলে তো কাস্টমার কমে যাবে। কীভাবে মেনে নেওয়া যায়! যে করেই হোক, একে দমানো দরকার।

সাজ্জাহ ঠিক করল মদিনা আক্রমণ করবে। মুসায়লামা সিদ্ধান্ত নিল সাজ্জাহকে সাইজ করবে। দলবল নিয়ে রওয়ানা করল মুসায়লামা। অন্যদিকে সাজ্জাহ রওয়ানা করল মদিনা আক্রমণ করার জন্য। রাস্তায় মোকাবিলা হলো দুই গ্রুপে। সাজ্জাহকে এক ঘরে আটকে রাখা হলো তিনদিন। এই তিনদিন বাইরে চলল যুদ্ধ, ভেতরে লটর-পটর। ভগ্না ভগ্নির প্রেমে মজে ভগ্নির সাথে চুক্তি করে ফেলল।

‘দুজনে মিলেমিশে খাই চলো।’

‘কীভাবে?’

‘চলো বিয়ে করে ফেলি।’

সাজ্জাহর সাথে মুসায়লামার বিয়ে হলো।

ভগ্ন মুসায়লামার সাথে ভগ্নি সাজ্জাহ বিয়ে করে যখন তার উম্মতের কাছে ফিরল এবং বিয়ের কথা জানাল, তখন তারা বলল, ‘বিয়া যে করলে, বিয়েতে মোহররানা কী ছিল?’

সে বলল, ‘মোহররানার কথা তো মনেই ছিল না।’

‘করছ কী? মোহররানা ছাড়া বিয়ে হয় নাকি? জলদি যাও। মোহররানা ঠিক করে আসো গিয়ে।’

সে আবার ফিরে গেল মুসায়লামার কাছে। আমরা যে বিয়ে করে ফেললাম, মোহররানা তো সাব্যস্ত হলো না।’

মুসায়লামা বলল, ‘বিয়ের মোহররানা বাবদ তোমার এবং তোমার উম্মতের এশা ও ফজরের নামাজ মাফ করে দেওয়া হলো!’

ভগ্ন মুসায়লামা সব সময় ওত পেতে থাকত। মদিনা থেকে কেউ ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করত কী দেখে আসলে? নবিজি থেকে কোনো বিশেষ মুজাজা দেখে আসলে কি না?

একবার একজন তাকে জানাল, নবিজি তাঁর সাথিদের নিয়ে বসা ছিলেন। তখন কিছু লোক এসে নবিকে জানাল, তাদের পানির সমস্যা চলছে। তারা বলল, ‘আমাদের পান করার মতো পানির জন্য একটাই কুয়া। কুয়ায়ও আবার পানি থাকে না। সামান্য পানি তলানিতে পড়ে থাকে। সেই পানিও আবার তিতে এবং বিস্বাদ।’

নবি বললেন, ‘আমাকে একটি গ্লাস দাও।’

তাকে গ্লাস দেওয়া হলো। তিনি সেই গ্লাসের পানিতে ফুঁ দিলেন। মুখ থেকে একটু থুথুও দিলেন। বললেন, ‘এই পানিকে নিয়ে তোমাদের কুয়ার মধ্যে ফেলে দাও। দেখো আল্লাহ কী করেন।’

লোকজন তাই করল।

সাথে সাথেই মিরাকলের মতো কুয়া পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। সেই পানিও আবার এত সুস্বাদু হলো যে, অকল্পনীয়।

মুসায়লামা তার উম্মতদের বলল, ‘আমার জন্যও এমন কোনো কুয়া তালাশ করো, যাতে আমিও কিছু করে দেখাতে পারি।’

খুঁজে বের করা হলো তেমন একটি কুয়া। মুসায়লামা ঠিক তাই করল, নবিজিকে যা যা করতে শুনেছিল। তারপর বলল, ‘যাও, এটাকে সেই কুয়ার পানির সাথে নিয়ে মিশিয়ে দাও।’

তাই করা হলো। এখানেও ঘটল মিরাকল। তিতা পানি মিটা হওয়া তো পরের কথা, দেখা গেল কুয়ায় যেটুকু পানি ছিল তাও সাথে সাথে শুকিয়ে গেল। সেই কুয়া আর কখনো পানি ভর্তি হলো না।

আরেকবার আরেকজন তাকে জানাল, একলোকের মাথায় চুল ছিল না। নবিজি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার পর তার মাথায় চুল গজিয়ে গেছে। শুনে মুসায়লামাও তার সাজপাঙ্গদের বলল, তোমাদের পরিচিতজনদের মধ্যে কোনো টাকুমাথা থাকলে আমার খেদমতে নিয়ে আসতে পারো। সমস্যা নেই।

একটাকে নিয়ে আসা হলো। তার মাথার তালু খালি হয়ে গেছে। অর্ধেক মাথা চুলশূন্য। মুসায়লামা লোকটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। সাথে সাথেই অ্যাকশন। লোকটার মাথায় অবশিষ্ট যে চুল ছিল, সেগুলোও ঝরে পড়ে গেল। সারা জীবনের জন্য লোকটা বেলমাথা হয়ে গেল। আল্লাহপাক এভাবেই যুগে যুগে মিথ্যাবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়ে মানুষের সামনে তাদের অপদস্থ করেছেন।

হজরত আবুবকর সিদ্দিকের শাসনামলে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা কাজ্জাবকে হত্যা করা হয়। মুসায়লামাকে হত্যাকারী সাহাবির নাম হজরত ওয়াহশি ইবনে হারব (রা.)। ওয়াহশি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সব সময় নবিজির সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হতো। নিজেও জ্বলতেন অর্ন্তদহনে।

ওয়াহশি তখন কাফির। ওহুদের যুদ্ধে নবিজির চাচা হজরত হামজা (রা.)-কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল ওয়াহশি। হত্যার পর মেতে উঠেছিল পাশবিক উন্মাদনায়। হজরত হামজার বুক ফেড়ে কলিজাটা বের করে মুখে নিয়ে পিশাচের মতো চিবুচ্ছিল সে। লাশটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। মুফাসসিরিণে কেরামগণ বলেছেন, নবির চাচার লাশটাকে সে কেটে আশি টুকরা করেছিল।

চাচার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে নবিজি অঝরে কাঁদছিলেন। ঝরঝর করে পানি পড়ছিল নবির চোখ দিয়ে। ওপর দিকে মুখ তুলে বলেছিলেন, ‘ও আল্লাহ! এবার তো রাজি হয়ে যাও। দেখো তোমার দ্বীনের জন্য আমার চাচার শরীর কত টুকরো হয়ে জমিনে পড়ে আছে।’

জানি না, হয়তো ওয়াহশি তাঁর জীবনে এমন কোনো ভালো কাজ করেছিল, যে কাজটি আল্লাহপাকের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়; বরং সেই যোগ্য হয়ে যায়, যে আল্লাহর অনুগ্রহ পায়। হতভাগা সেই ওয়াহশির ভাগ্য সুপ্রসূ ছিল। এত বড়ো পাপ করার পরও আল্লাহ তাকে ফিরে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আসলে আল্লাহ যদি কাউকে মাফ করে দিতে চান, তাহলে ঘাড় ধরে তাকে লাইনে নিয়ে আসেন।

সহিহ বুখারিতে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি বেশ মজাদার এবং আমাদের মতো নামকাওয়ান্তের মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট আশাব্যঞ্জকও।

যুদ্ধে পরাজিত এক সরদারকে ধরে আনা হলো। তাকে বলা হলো ইসলাম কবুল করে ফেলো। তাহলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সে বলল, ‘তোমরা কি জানো আমি কে?’

নবিজি বললেন, ‘এটাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখো। ক’দিন বাঁধা থাকুক।’

সাহাবায়ে কেরাম তাকে লোহার জিনজির দিয়ে বেঁধে রাখলেন।

দু-একদিন পর নবিজি বললেন, ‘যাও দেখো কী বলে।’ সাহাবিরা গিয়ে বললেন, ‘বললাম ঈমান আনতে। তাহলে তো ছাড়া পেয়ে যেতে। কেন বুঝতে পারছ না।’ সে বলল, ‘তোমরা আমাকে আটকে রেখে কত বড়ো ভুল করছ বুঝতে পারছ না।’ নবিজে বললেন, ‘থাকতে দাও। এটাকে আরও কিছুদিন এভাবে থাকতে দাও। হুশ এখনও ঠিকানায় আসেনি।’

এক পর্যায়ে সে বলল, ‘ওগো নবি! আমার মনে প্রথম দিনই ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমি তখনই মনে মনে ইসলাম কবুল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। এত দিন ধরে সেটা প্রকাশ করিনি। কারণ, কেউ যেন না বলতে পারে- এত বড়ো সর্দার আর ভয়ে ইসলাম কবুল করে ফেলল। আমি ভয়ে ইসলাম কবুল করছি না। ইসলামের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েই ইসলাম কবুল করছি। নবিজি বললেন, কিছু কিছু লোক জান্নাতে যেতে না চাইলেও আল্লাহপাক তাকে জিনজির দিয়ে বেঁধে জান্নাতে নিয়ে যান।

ওয়াহশি ইবনে হারব সে রকমই এক ভাগ্যবানের নাম। হজরত হামজাকে হত্যা করার কিছুদিন পর সে নবির কাছে সংবাদ পাঠাল, ‘আমি যদি মুসলমান হতে চাই! সুযোগ আছে কি না?’

নবিজি বললেন, ‘ইসলামের দরজা সকলের জন্য খোলা।’

সে বলল, ‘আমি মুসলমান হলে আমার পেছনের গুনাহ কি মাফ হবে?’

নবিজি বললেন, ‘ইসলাম গ্রহণ করে নিলে আগের সব গুনাহ মাফ।’

সে বলল, ‘আমার যে মাফ হবে তার নিশ্চয়তা কী?’

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সূরায়ে জুমর-এর ৫৩ নং আয়াত ‘ইন্নাঈলাহা ইয়াগফিরুজ-জুনুবা জামিয়া’র তাফসির দেখা যেতে পারে।

ওয়াহশি ইবনে হারব ছিল হজরত হামজার মতো সাহাবির ঘাতক। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেই ওয়াহশি হয়ে গেলেন হজরত ওয়াহশি ইবনে হারব (রা.)। এটাই ইসলামের শক্তি। তবে, ইসলাম কবুল করার পরও হজরত ওয়াহশির বুক থেকে অপরাধবোধটা দূর হচ্ছিল না। অনুশোচনায় বিদ্ধ হচ্ছিলেন তিনি। নবিজির দুষমন মুসায়লামাকে হত্যা করার পর তাঁর মনটা একটু শান্ত হয়েছিল।

সাজ্জাহ নামক মহিলাকেও আমি ভাগ্যবতী বলতে চাই। একটা পর্যায়ে গিয়ে সেও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। হজরত আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) জামানায় সে তওবাহ করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে।

তুলাইহা আসাদি নামে একলোকও নবুয়ত দাবি করল। সে ছিল একজন গণক। পরবর্তীতে সেও তার ঘাড় থেকে শয়তানকে নামাতে সক্ষম হয়। খলিফাতুল মুসলিমিন আবুবকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাতে বাইআত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কৃতকর্মের লজ্জায় ইসলাম গ্রহণের পরে আর খলিফাতুল মুসলিমিনের সামনে আসেনি।

আরবের প্রসিদ্ধ কবি ‘মুতানাব্বি’ও নিজেকে নবি দাবি করেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য সেও তওবাহ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

হজরত আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের (রা.)-এর জামানায় ‘মুখতার সাকারী’ নামে একলোক নিজেকে নবি দাবি করল। খলিফা মু’তামিদ বিল্লাহর জামানায় ‘বাহবুদ’ নামে আরেক ব্যক্তি নবি দাবি করেছিল। খলিফা মুকতাবি বিল্লাহর জামানায় ‘আকরওয়াতুল কুরমুতি’ নামে আরেক ব্যক্তিও নবি দাবি করেছিল। নাওয়াহে নিহাওয়ান্দ নামক স্থানে আরেক ব্যক্তিও নবি দাবি করেছিল বলে ইতিহাসের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়।

আজিব আজিব কিছু চিড়িয়াও আজিব আজিব তরিকায় নবুওয়তের দাবি করেছিল। যদিও তাদের পাগলামির পেছনে মানুষের সমর্থন পায়নি। এর মধ্যে এক পাগলের কথা বলি। সে তার নাম রেখে দিলো ‘লা’। লাম আলিফ জবর লা। একপর্যায়ে সে ঘোষণা করল, আমি একজন নবি। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তুই যে নবি, দলিল কী?’

সে বলল, নবিজি নিজেই আমার কথা বলে গেছেন।’

‘নবিজি মানে মুহাম্মাদ ﷺ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর কথা কোথায় বলে গেছেন?’

নবিজি বলেছেন, ‘লা নাবিয়্যা বা’দি। আমার পরের নবি হবে ‘লা’। আমি হলাম সেই ‘লা’।’

আরেক পাগলের নাম ছিল নায়িম। তারও শখ হলো নবি হতে। লোকজন বলল, ‘তুই কেমন করে নবি হলি?’

সে বলল, ‘আমার নবুওয়তের দলিল কুরআন শরিফ। কুরআনে বলা হয়েছে যারা আমার অনুসরণ করবে না এবং আমার কথা মানবে না, কিয়ামতের দিন তারা জিজ্ঞাসিত হবে।’

লোকজন বলল, ‘কুরআনে এভাবে কোথায় বলা আছে?’

সে বলল, ‘সূরায়ে তাকাসুর আয়াত নম্বার ৫, আল্লাহ বলেছেন, ‘সুম্মা লাভুসআলুন্না ইয়াওমাইজিন আনিন-নায়িম। অতঃপর তোমরা অবশ্যই নায়িম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’” (টীকা : নায়িম মানে নিয়ামতসমূহ।)

এই তালিকায় মুসলমানদের মোটামুটি উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে পথভ্রষ্ট করতে পারা সর্বশেষ নাম হলো মির্জা গোলাম কাদিয়ানি। ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে জন্ম নেওয়া এই শতকের সবচে বড়ো খান্নাস ছিল সে।

আসলে আমাদের উপমহাদেশের একটা কালচার হলো— যে কেউ যেকোনো দাবি করে বসলে সেও কিছু ভক্ত ঝুটিয়ে ফেলে। তার পেছনেও জিন্দাবাদ বলার মতো কিছু লোক তৈরি হয়ে যায়।

এক পিরের এক মুরিদ ছিল। সময় পেলেই সে তার পির বাবার দরবারে যাওয়া-আসা করত। এক পর্যায়ে পির সাহেবের খাস নজরে পড়ে গেল সে। বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় তার একটা গাধা বাচ্চা ছিল, মুরিদকে সেটা উপহার দিয়ে দিলেন। মুরিদ পির বাবার গাধার বাচ্চা নিয়ে বাড়ি চলে আসল।

তারপর কয়েক মাস চলে গেছে। পির সাহেব লাখ করলেন, ‘সেই মুরিদটি আর আসছে না। ব্যাপার কী? কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো! অথবা কে জানে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে কি না।

খোঁজ নেওয়ার জন্য পির সাহেব নিজেই চলে গেলেন মুরিদের বাড়িতে। গিয়ে দেখলেন মুরিদ ব্যাটা নিজেই একখান দরবার খুলে বসেছে। পিরবাবাকে দেখে উঠে এসে কদমবুছি করল লোকটি। পির বললেন, ‘বুঝলাম না, এখানে কে কবে মারা গেলেন? কার কবরের ওপর চান্দুয়া টানিয়ে তুই এই মাজার খুলে বসলি?’

মুরিদ কাম নব্য পির বলল, ‘বাবা! আপনার কাছে লুকানোর কিছু নেই। আপনি আমাকে যে গাধার বাচ্চাটি দিয়েছিলেন, আমি বাড়ি এসে সেটাকে মেরে তার কবরের ওপরই এই মাজার খুলে বসেছি। আর আপনার দুআয় ব্যবসাও মন্দ হচ্ছে না।’

পির সাহেব বললেন, ‘হিম্মত কর ব্যাটা। আমার কাছে তো তার মা-ই।’



মির্জা কাদিয়ানি ভিশন এবং মিশন


আটার শতকের শেষ কোয়ার্টার। ইংরেজরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের দ্বারা বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। দেশের মাটিকে স্বাধীন করার জন্য আলেম-ওলামা জিহাদের ডাক দিয়ে বসেন। মুসলমানরাও তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে। মুসলমানরা নাকে দম করে রেখেছে তাদের। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটাই উপায়; জিহাদ থেকে মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় করা।


কিন্তু সেটাই-বা কীভাবে সম্ভব?

জিহাদ ছেড়ে দাও- বললেই তো আর হলো না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা ইংরেজদের কাছে নাখে খত দিয়ে তাদের ফরমাবরদারির অঙ্গিকার করেছিল এবং বলেছিল- ‘আছি আপনাদের সাথে’, তাদের কাজে লাগানো হলো। ‘বাবারা, নুন খাচ্ছে, শুধু গুণ গাইলেই হবে না, কাজও করতে হবে। জিহাদ বন্ধ করার উপায় খুঁজে বের করো।’

ইংরেজদের নিমকহালালরা উপায় একটা খুঁজে বের করে দিলো। এক হাদিসে নবিজি ﷺ হজরত ইসা -এর পুনরাগমনের ব্যাপারে বলেছেন, ‘... ইসা -এর যুগে জিহাদ রহিত হয়ে যাবে। তিনি জিহাদ রহিত বলে ঘোষণা দেবেন।’

হাদিসটির মানে হলো, হজরত ইসা দাজ্জালকে খতম করার পর ইহুদিয়ত এবং নাসরানিয়তও শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তখন শুধুই ঈমানদার মুসলমানের বাস। একজন বেইমানও আর অবশিষ্ট নেই। কিয়ামতও তখন খুবই কাছে। সংগতকারণে তখন আর জিহাদেরও দরকার পড়বে না। আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে ইসা  জিহাদ রহিতের ঘোষণা দেবেন।

ইংরেজরা দেখল মুসলমানদের দমাতে হলে তাদের জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। আর সেটা একমাত্র ইসা -ই পারেন। এখন কাউকে ইসা বানিয়ে দিতে পারলে এবং তার মুখ দিয়ে জিহাদ

রহিত মর্মে ঘোষণা দেওয়ানো গেলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। মির্জা গোলাম কাদিয়ানিকে বেছে নেওয়া হলো। সে এসে সেই কাজটিই করতে শুরু করল, যে জন্য তাকে তৈরি করা হয়েছে।

মির্জা তার জীবনে নবি, রাসূল, আল্লাহ... যত কিছু হওয়ার দাবি-করেছে, সেগুলো ছিল তার ভণ্ডামির এক একটা শাখা। মূল ভণ্ডামি ছিল মসিহে মাওউদ বা ইসা হওয়ার দাবি করা। তার জন্মদাতা ইংরেজরা জানতো মুসলমানরা বিশ্বাস করে হজরত ইসা ﷺ আবারও পৃথিবীতে আসবেন।

মির্জা কাদিয়ানির মূল টার্গেট ছিল হজরত ইসা ﷺ হওয়া। আর কথাটিকে বাজারজাত করতে গিয়ে কখনো তাকে মুহাম্মাদ সাজতে হয়েছে, কখনো মারইয়াম আবার কখনো স্বয়ং খোদা। মির্জাপুত্র বশির লিখেছে—

اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا انکار بھی کفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں تو (نعوذ باللہ) نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحانیت اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے۔ آپ کا انکار کفر نہ ہو

যেহেতু মুহাম্মদ এবং মির্জা একই সত্তা, তাই নবিয়ে কারিমের মুনকির কাফির হলে মির্জার কাদিয়ানির মুনকির কাফির হওয়া দরকার। আর মির্জার মুনকির কাফির না হলে মুহাম্মদের মুনকিরও কাফির হবে না। এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, প্রথম জন্মে তাঁকে (মুহাম্মাদ) অস্বীকার করলে কুফরি হবে কিন্তু দ্বিতীয় জন্মে, যে জন্মে তার রূহানিয়্যত আরও দৃঢ় এবং আরও মজবুত ও পরিপূর্ণ, তখন তাকে অস্বীকার করলে কুফরি হবে না! - কালিমাতুল ফসল, পৃষ্ঠা ১৪৭।

দাবি পরিষ্কার না হলেও উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল। যেন-তেন কায়দায় মির্জাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র প্রতিপক্ষে দাঁড় করিয়ে মুসলমানদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করা।

অতঃপর, মির্জা ইংরেজদের হুকুমে তাদের মূল পারপাস সার্ভ করা শুরু করল। সে তার দুররে সমিন গ্রন্থে লিখল—

‘লুগৌকো বাতাও কে ইয়ে ওক্তে মসিহ হে,
জানোয়ার জিহাদ আব হারাম আওর কবিহ হে।

লোকজনকে বলে দাও এটা ইসা মসিহ'র যুগ।
জানোয়ার জিহাদ এখন থেকে হারাম এবং নিকৃষ্ট।

সে ঘোষণা করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন, মসিহ ﷺ-এর সময় জিহাদ খতম হয়ে যাবে। আমিই মসিহ এবং আমি জিহাদ খতমের এলান করছি।

তারপর একে একে শুরু হলো মির্জার বকওয়াস। একেক সময় একেক পাগলামি। যখন যা খুশি। যারা মির্জার জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটু আধটু জানেন, তারা ভেবে পেরেশান হতে থাকলেন, এমন একটা মাথা খারাপ লোককে কিছু লোক কীভাবে গ্রহণ করল?

মির্জা কাদিয়ানির জীবনের পরতে পরতে ছেয়ে আছে পাগলামি। আর তার এসব পাগলামি প্রমাণ করার জন্য অন্য কোথাও যেতে হয় না। খোদ তার নিজের লেখা কিতাবাদিই যথেষ্ট। তার আগে চলুন মির্জার খান্দান এবং শিক্ষা-দীক্ষার দিকটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

মির্জার খান্দান

একজন মানুষের বংশ একটাই থাকে। কেউ হয় খান, কেউ সৈয়দ, কেউ তালুকদার কেউ চৌধুরি, মোগল অথবা পাঠান। কেউ নাজায়েজ আওলাদ হলে তার কথা আলাদা। সম্ভাবনা থাকে শরীরে অনেক বংশের রক্ত একই সাথে প্রবাহিত হওয়ার। নাজায়েজ আওলাদকে ফারসিতে বলে হারামজাদা।

মির্জা গোলাম কাদিয়ানি কোন বংশের ছিল? কোন খান্দানের চেরাগ ছিল সে? হালালজাদার বংশ থাকে একটা- কথাটি মাথায় রেখে চলুন দেখে আসা যাক, মির্জার বংশ পরিচয় কী ছিল।

চেরাগ বলায় মনে পড়ল; পরে বলতে ভুলে যেতে পারি তাই এখানেই বলে ফেলি। মির্জার দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান দাবি ছিল সে ইবনে মারইয়াম। ইবনে মারইয়াম মানে মারইয়াম পুত্র ইসা। মানে তার মায়ের নাম মারইয়াম। অথচ সে ছিল চেরাগ বিবির ছেলে। অর্থাৎ তার মায়ের নাম ছিল চেরাগ বিবি।


মির্জা তার কিতাবুল বুরিয়ায় লিখেছে, ‘আমার খান্দান হলো মোগল।’

অর্থাৎ সে মোগল বংশের লোক।

কিছুদিন পর তার সামনে পড়ল কুরআনে কারিমের আয়াত ‘ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম।’ সেইসাথে নবিজির হাদিস ‘লাও কানাদ-দ্বীনু ইনদাস-সূরাইয়া, লা-তানাওয়ালাহু রাজুলুম মিন ফারিস’। দ্বীন যদি সূরাইয়া নামক তারকার কাছেও চলে যায়, সেখান থেকেও আমার এক ফারসি উম্মত দ্বীনকে নিয়ে আসবে... তখন সে ঘোষণা করল, আল্লাহ আমাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমার দুই/তিন নানি ইরানি ছিলেন। সুতরাং আমি ফারসিউন নসল।

তার দাবি ছিল সে ইসা মসিহ। এখন ইসা হতে হলে তো মারইয়ামপুত্র হওয়া দরকার। চিন্তাভাবনা করে কিছুদিন পর সে জানাল, ‘আল্লাহ আমাকে মারইয়ামের মতো গর্ভবতী বানালেন... তারপর মুঝসে মায়হি পয়দা হোগিয়া- আমার গর্ভ থেকে আমিই সৃষ্টি হলাম। অর্থাৎ আমি মারইয়ামের গর্ভ থেকে আমি ইসার জন্ম হলো।’ (কিশতিয়ে নুহ, ৪৭।)

ইবনুল আরাবি লিখেছেন ‘আমার কাশফ হলো দুনিয়ার সর্বশেষ মানুষ চীন দেশে জন্মাবে’। মির্জা শেষ সন্তানকে শেষ মুজাদ্দিদ তাওয়িল করে সে জানাল, ‘আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন তোর এক দাদি চীনের ছিলেন। সুতরাং আমি একটু একটু চায়নিজও।’

কেউ একজন তাকে আবু দাউদ শরিফের একটি হাদিস দেখাল; ইমাম মাহদি  হজরত ফাতেমার বংশ থেকে হবেন। মির্জার দাবি ছিল সে ইমাম মাহদিও। সুতরাং তাকে এখন সৈয়দ হওয়া দরকার। সে জানাল, ‘আমি একদিন মাগরিবের পরে মোরাকাবায় ছিলাম। দেখলাম চারজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে আসার পর দেখি মা ফাতিমা, সাথে হজরত আলি এবং হাসান-হুসাইন। ফাতিমা আমার কাছে এসে মায়ের মমতা নিয়ে আমার উরুতে মাথা রাখলেন। মানে বলতে চাইলেন, তুই আমার সন্তান।’

সহিহ হাদিস অনুসারে, ইমাম মাহদির জন্ম হবে মদিনায়। মির্জা নিজেকে ইমাম মাহদি দাবি করার পর যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। মানুষ বলতে লাগল ইমাম মাহদির জন্ম তো মদিনায় হওয়ার কথা। তুমি ভারতে কীভাবে জন্মালে?

মির্জার বন্ধুরা আবু দাউদ শরিফ থেকে জয়িফ আরেকটি হাদিস খুঁজে বের করে দিলো। যেখানে বলা হয়েছে— ইমাম মাহদির জন্ম ‘কারআহ’ নামক স্থানে হবে (কার’আহ= কাফ, রা, আইন, হা)। মির্জা বলল, ‘কারআহ থেকে কাজিয়া হয়েছে। কাজিয়া থেকে কাদিয়া। কাদিয়ান বা কাদিয়া আসলে কাজিয়া ছিল। কিছু এলাকায় দ্বোয়াদের উচ্চারণ দাল পড়া হয়।’

সব মিলিয়ে তার খান্দান হয়ে গেল পাঁচটি।

মোগল।

ইরানি।

ইসায়ি।

সৈয়দ।

চায়না।

কীভাবে সম্ভব? একটা লোক একই সাথে পাঁচ বংশের হয় কী করে। বংশ তো এক রক্ত থেকেই ধাবিত হওয়ার কথা। হালালজাদার শরীরে তো এক পুরুষের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কথা। মির্জা গোলাম পাঞ্জাবি ছিল। পাঞ্জাব পাঁচ থেকে হয়। এজন্যই সে পাঁচ পানির তৈরি কি না- কে জানে। হলে হতেও পারে। আমি জানি না।

মির্জার পড়ালেখা

নবিদের কোনো উস্তাদ থাকেন না। আল্লাহপাক তাঁর কোনো নবিকেই দুনিয়ার কোনো উস্তাদের কাছে ইলম হাসিল করাননি। যেটুকু দরকার সরাসরি শিক্ষা দিয়েছেন। আর সেটুকুর পরিমাণও উম্মতের সমষ্টিক ইলম থেকে বেশি ছিল। এর কারণ, উস্তাদের মর্যাদা শাগরেদ থেকে বেশি হয়। সমসাময়িক যুগে নবি থেকে মর্যাদাবান আর কেউ হন না। হতে পারেন না। নবিগণ যদি কোনো উস্তাদের কাছে পড়তে যেতেন, তাহলে তাঁরা হতেন নবি থেকে শ্রেষ্ঠ; যা শানে নবুওয়তের খেলাফ হতো।

মির্জা গোলাম কাদিয়ানির প্রথম উস্তাদের নাম ফজলে এলাহি। ফজলে এলাহি ছিল বেরলবি মাসলাকের অসুসারী। দ্বিতীয় উস্তাদ ফজল আহমদ ছিল একজন আহাফি তথা গায়রে মুকাল্লিদ। তৃতীয় উস্তাদ সৈয়দ গোল আলি শাহ শিয়া ছিল। আর মির্জার আয়ুর্বেদিক উস্তাদ ছিল তার বাবা হাকিম গোলাম মর্তুজা।

মির্জার কর্মজীবন শুরু হয় চুরির মাধ্যমে। মির্জা কাদিয়ানির বাবা ৭শ টাকা বার্ষিক পেনশন পেতেন। বাবাজির পেনশনের টাকা মেরে মির্জা তার বন্ধু ইমাম উদ্দিনকে নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। তখনকার ৭শ টাকাও বেশ বড়ো অঙ্কের টাকা ছিল। বাবার চুরি-বিদ্যার কাহিনিটা আবার মায়ের রেফারেন্সে ঢোল পিটিয়ে দুনিয়াকে জানিয়েছেন গুণধর পুত্র মির্জা বশির। তথ্যসূত্র : সিরাতুল মাহদি প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৮/৩৯।

কয়েকদিনের মধ্যেই চুরির টাকা শেষ হয়ে গেল। এখন কোন মুখ নিয়ে ঘরে ফেরা যায়? মনে পড়ল বন্ধুর কথা। মির্জার এক শিক বন্ধু লালা ভিমচান শিয়ালকোট আদালতে কাজ করত। তার কাছে গিয়ে বলল ‘বন্ধু, কিছু একটা কাজ দে আমাকে।’

ভিমচান বলল, ‘এখানে কী কাজ দেবো তোকে? কী করতে পারবি তুই?’

‘কিছু একটা। খেয়ে পরে তো বাঁচতে হবে।’

‘আরজি লেখার কাজ করতে পারবি?’

‘পারব। না পারলে শিখে ফেলব।’

লালা ভিমচানের কৃপায় কোর্টের বারান্দায় একটি টুল আর টেবিল নিয়ে বসে শুরু হলো মির্জার নতুন জীবন। সারাদিন আরজি-টারজি লিখে দু-চার পয়সা যা পায়, তা দিয়েই পেট চলে।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর ভিমচান বলল, ‘চল আমরা এক কাজ করি। একটা পরীক্ষা দিয়ে ফেলি। পরীক্ষা দিয়ে মুক্তার হয়ে যেতে পারলে চাকরিটা সরকারি হয়ে যাবে।’

চার-পাঁচজন মিলে পরীক্ষা দিলো। সবাই পাশ করল, শুধু মির্জা ফেল। এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মির্জাপুত্র বশির লিখেছে, ‘আসলে আল্লাহপাক হজরতকে উম্মি রাখতে চেয়েছিলেন, তাই আব্বাজানকে ফেল করিয়ে দেন’। ছাগলের ঘরে ছাগলই পয়দা হয়। পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলে বলে উম্মি হয়। তা ছাড়া তার বাপ যে তিন উস্তাদের কাছে পড়ালেখা করল, সেটার কী হবে?

বাপ-দাদা মরার পর মির্জা আবারও কাদিয়ানে ফিরে আসে। যেহেতু আরজি টারজি একটু লিখতে শিখে এসেছে, তাই গ্রামে এসে এই কাজই শুরু করল। সবাইকে জানাল কেউ মামলা-টামলা করলে আরজি লেখার জন্য উকিল-মুজারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তার কাছে আসলেই হবে; সে করে দেবে। কোর্টে কোনো কাজ থাকলে সেটাও সে করে দিতে পারবে। মোটকথা গ্রামে ফিরে এসে কোর্ট-দালালি আর মামলাবাজিকে পেশা হিসেবে বেছে নিল সে। এভাবেই চলতে লাগল মির্জার দিনকাল।

কিছুদিন পর টের পেলো এসব করে ঠিকমতো পেটের ভাত জোটানো যাবে না। অন্য ধান্ধা ধরতে হবে। অন্য কিছু করতে হবে।

কী করা যায়।

মনে পড়ল ছোটোবেলার বন্ধু মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবির কথা। যার হাতধরে একসাথে বড়ো হয়েছে সে। বাটালবি তখন লাহোরের এক মসজিদে খতিবগিরি করছিল। মির্জা তার কাছে গিয়ে বলল, ‘বন্ধু, মামলাবাজিতে পেট ভরে না। আমাকে পরামর্শ দে কী করব?’

‘কী করতে চাস বল?’

‘আমি কী জানি। তুই বল।’

‘আমার কাছে চলে আয় লাহোরে। দেখি কী করা যায়।’

মির্জা চলে গেল লাহোরে। বাটালবি তাকে বিনা পুজির একটা ব্যাবসা বাতলে দিলো। পরিকল্পনা পছন্দ হলো মির্জার। লেগে গেল কাজে। সেখানে আরও তিন/চার লামাজহাবি বন্ধুও জুটিয়ে নিল সে। শুরু হলো নতুন ধান্ধা। ধান্ধাটি ছিল তাবলিগে ইসলামের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

বন্ধুদের নিয়ে হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের সাথে মুনাযেরা করে বেড়াতে লাগল সে। কোথাও মুনাযেরা করতে যায়। নাকানি-চুবানি খেয়ে ফিরে এসে লম্বা লম্বা মাত দেয়... আজ অমুক পাদরিকে হারিয়ে দিয়ে এসেছি। আজ অমুক জায়গায় তমুককে সাইজ করে এলাম। শুরু হলো তার চ্যালেঞ্জবাজি। মাঝে মাঝে আবার মোল্লা দুপিয়াজার ভানও ধরতে লাগল।

মোল্লা দুপিয়াজার ছিলেন একটি ঐতিহাসিক এবং মজাদার চরিত্র। তাঁর নাম ছিল মাহমুদ উমর। অনেক বড়ো আলেম ছিলেন তিনি। তবে মাঝেমধ্যে অবস্থা বুঝে চমৎকার কিছু ব্যবস্থাও নিতে জানতেন। ওই যে! কথায় আছে না, এক মন ইলমের সাথে নয় মন আকল লাগে।

একবার শিয়াদের সাথে মুনাযেরা ঠিক হলো তাঁর। তিনি গরুর গাড়িতে করে একগাড়ি কিতাব নিয়ে ছুটলেন মুনাযেরার উদ্দেশ্যে। একগাড়ি কিতাবের রহস্য হলো, বিশাল সাইজের একটি পাথর এবং বিশালাকায় একখান ইটকে গিলাফ দিয়ে ঘিরে রাখলেন। সেগুলোই তাঁর কিতাব ছিল।

পাগড়ির শিমলা এত লম্বা ছিল যে, সেটা পেছন থেকে চারটি টুকরি ভর্তি করে চারজন মুরিদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। শিমলা হলো পাগড়ির পেছন দিকে ঝুলন্ত অংশটা। আরও দুইজন সামনে হুক্কা বহন করে আগে আগে চলছে। মোল্লা দুপিয়াজা পায়ের জুতা খুলে বগলে রেখেছেন। চলেছেন মুনাযেরায়।

মুনাযেরার জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে পৌঁছাতেই প্রতিপক্ষ দলের মুনাযিররা মোল্লা সাহেবের এই হালত দেখে হাসতে লাগলেন। মোল্লা বললেন, ‘হাসাহাসি করছেন কেন?’

ওরা বলল, ‘মাফ করবেন জনাব। আপনার পাগড়ি আর হুক্কোর অবস্থা দেখে হাসি ধরে রাখতে পারছি না।’

তিনি বললেন, ‘হাসাহাসির কিছু নেই। হুক্কা বমিকদারে চিলম, শিমলা বমিকদারে ইলম। অর্থাৎ চিলিম অনুপাত হুক্কা, আর ইলম অনুপাত পাগড়ি।’

তারা বলল, ‘গাড়িতে কী?’

তিনি বললেন, ‘কিতাব।’

‘এত বড়ো বড়ো কিতাব! সুবহানাল্লাহ। নাম কি কিতাবের?’

তিনি বললেন, ‘একটার নাম ইটুল ফাতাওয়া, আরেকটার নাম সিল্লুল বহর।’

ওরা চিন্তায় পড়ে গেল। এগুলো আবার কোন কিতাবের বাবা! জীবনে নামই শুনলাম না! ওরা বলল, ‘জনাব, জুতা বগলে কেন?’

তিনি বললেন, ‘কিতাবে পড়েছি শিয়ারা জুতা চোর। ওরা একবার আল্লাহর রাসূলের জুতাও চুরি করে ফেলেছিল। তাই জুতা হেফাজত করছি।’

শিয়া মুনাযির বলল, ‘মিথ্যা কথা। আল্লাহর রাসূলের যুগে শিয়া ছিলই না। তাহলে কীভাবে জুতাচুরি করবে?’

মোল্লা বললেন, ‘দুঃখিত। আমি বলতে ভুল করেছি। এটি হজরত আবুবকর সিদ্দিকের কথা। ঘটনাটি আবুবকরের সাথে ঘটেছিল।’

ওরা বলল, ‘সেটাও মিথ্যা। আবুবকরের যুগেও শিয়া ছিল না।’

মোল্লা দুপিয়াজা মাথায় হাত দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘আসলে অনেকদিন আগের পড়া তো, তাই ভুল করছি। ঘটনাটি আসলে হজরত উমর (রা.)-এর সময়ের। শিয়ারা হজরত উমরের জুতা চুরি করেছিল।’

তারা বলল, এটাও ডাছা মিথ্যা। উমরের যুগেও শিয়া ছিল না।

তিনি বললেন, ‘তাহলে মনে হয় হজরত উসমানের কথা পড়েছিলাম।’

তারা বলল, ‘কী সব আবুল-তাবুল বকছেন। উসমানের যুগেও কোনো শিয়া ছিল না।’

এবার মোল্লা দুপিয়াজা স্বরূপে ফিরলেন। বললেন, তোমরা শিয়ারা নবিজির যুগেও ছিলে না, আবুবকর সিদ্দিকের যুগেও ছিলে না, উমরের যুগেও না, উসমানের যুগেও না, তাহলে তোমরা

কোন খেতের মূলা? নবিযুগ, আবুবকর উমর উসমানের যুগেও যাদের অস্তিত্ব থাকে না, তারা যে পথভ্রষ্ট, সেটার প্রমাণে আর কী লাগে।’

লোকজন চিৎকার করে হাততালি দিয়ে উঠল।

মুনাজেরা শুরু হওয়ার আগেই হেরে গেল শিয়ারা।

রায়িসুল মুনাজিরিন হুজ্জাতুল্লাহি ফিল আরদ্ব মাওলানা মোহাম্মাদ আমিন উকাড়বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চমৎকার একটি চুটকি বলতেন। এক লোক নিজেকে নবি ঘোষণা করে বসল। বাদশাহ তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। তাকে ধরে আনা হলো। তিনি বললেন, তুমি নবি?

সে বলল, ‘জি জাহাপনা।’

‘তাহলে একটা মুজেজা দেখাও।’

‘ব্যাপার না। বলুন কী দেখতে চান?’

‘তুমি কি মূর্দাকে জিন্দা করে দেখাতে পারবে?’

সে বলল, আদেশ দিন। এক্ষুনি আপনার উজিরকে কতল করে আবার জিন্দা করে দেখাচ্ছি।

পাশে বসা উজির দাঁড়িয়ে বললেন, কোনো দরকার নেই। আমি কোনো মুজেজা না দেখেই আপনার ওপর ঈমান নিয়ে আসলাম।


মির্জা গোলাম কাদিয়ানিও মাঝেমধ্যে মোল্লা দুপিয়াজার স্টাইল ধরতে চেষ্টা করত। কিন্তু তলানিতে ইলম না থাকার কারণে প্রায়ই তাকে ধরা খেতে হতো।

মির্জার ধরা খাওয়া

একবার ভারতের অমৃতসারে খ্রিষ্টানদের সাথে বেশ ভালোই ধরা খেয়েছিল সে। মির্জার নিজের লেখা বই জঙ্গে মুকাদ্দস, সিরাজে মুনির এবং নুরুল ইসলামে দেওয়া তথ্যের আলোকে তার ধরা খাওয়ার কাহিনি শোনা যাক।

মির্জার বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হতে হতে খ্রিষ্টানরা তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ফেলল। বলল, ‘চলো’ মুনাজেরা করি।

মির্জা বলল, ‘ঠিক আছে।’

নির্ধারিত দিনে মির্জা তার এক চেলাকে সাথে নিয়ে মুনাজেরায় হাজির হলো। অপরদিকে ছিল খ্রিষ্টান পাদরি ক্লার্ক এবং মুরতাদ আব্দুল্লাহ আতম। শুরু হলো মুনাজেরা। মির্জা বলল, ইঞ্জিলে লেখা আছে ইসা  তাঁর উম্মতকে বলেছেন, “ইমানের নিশানি হলো, তোমাদের মধ্যে যদি ঈমান থাকে, তাহলে তোমরা পাহাড়কে গুড়ো হয়ে সমুদ্রে মিশে যাও বললে তাই হবে।” এখন

আমি খ্রিষ্টান পাদরিদের বলতে চাই, তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে আমার সামনে একটি পাহাড়কে গুড়ো করে দেখাও দেখি।

খ্রিষ্টান পাদরিরা জবাব দিলো, ‘এটা তো ইসা ﷺ-এর হাওয়ারিয়িনদের বেলায় বলা হয়েছে, সাধারণ খ্রিষ্টানদের জন্য না। সুতরাং আমাদের মধ্যে সেই ঈমান আসবে কীভাবে? এখন তোমাকে আমরা বলি। তোমাদের কুরআনে আছে কুরআনকে যদি পাহাড়ের ওপর নাজিল করা হতো, তাহলে পাহাড় ভেঙে খান খান হয়ে যেত। দেখি আমাদের সামনে কুরআনকে একটা পাহাড়ে রাখো তো। দেখি পাহাড় ভাঙে কি না।’

মির্জার স্টক শেষ। তলানিতে করে যা নিয়ে গিয়েছিল, সেটা শেষ হয়েছে। তার কাছে এই প্রশ্নের জবাব ছিল না। মুনাযেরা পরের দিন পর্যন্ত মূলতবি করে সেদিনের মতো রক্ষা পেলো সে।

দ্বিতীয় দিন খ্রিষ্টানরা তাকে অন্যভাবে পাকড়াও করল। তারা বলল, ‘আচ্ছা তুমি তো মসিহ হওয়ারও দাবি করো, তাই তো?’

মির্জা বলল, ‘হ্যাঁ। আমিই মসিহ।’

তারা বলল, ‘এখনই পরীক্ষা হয়ে যাক, তুমি সত্যি মসিহ নাকি বেইমান। আমরা এখানে একটি লাশ নিয়ে আসব। সাথে একজন বোবা, একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু। তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, মূর্দাকে জিন্দা করা এবং বাকিদের গায়ে হাত বুলিয়ে তাদের সুস্থ করে দেওয়া। ইঞ্জিলের মধ্যে এটাও আছে যে, মসিহ ﷺ আল্লাহর হুকুমে এসব কাজ করতে পারতেন। তুমি মসিহ হলে তোমারও পারার কথা। যদি পারো, তাহলে তোমাকে মসিহ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় কি না- ভেবে দেখা যাবে।’

মির্জা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তিরটা এভাবে ছুটে আসবে সে ভাবেনি। বলল, দেখো, আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে কিছু করি না। আল্লাহ আমার ব্যাপারে বলেছেন, “ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া।” সুতরাং আমাকে ইস্তেখারা করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানতে হবে। তার আগে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না।’

তারা বলল, ‘ঠিক আছে।’

‘পরেরদিন এসে সে জানাল, ‘আমি ইস্তেখারা করে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন— এখন আর এসব করে দেখানোর দরকার নেই। তুমি বরং তাদের গিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে দাও যে, ১৫ মাসের মধ্যে ক্লার্ক এবং আব্দুল্লাহ আতমের ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসবে। এমন কঠিন আজাব যে, পৃথিবীতে এর আগে আর কেউ এত কঠিন আজাবে পড়েনি। সেই আজাবেই তারা মারা যাবে। আর সেদিন ঝাকেকাকে খ্রিষ্টানরা মুসলমান হতে থাকবে।’ সে বলল, ‘যদি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য না হয়, তাহলে আমি সবচেয়ে বড়ো বেইমান এবং সবচেয়ে বড়ো শয়তান হবো। আমাকে যেন ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়।’

আল্লাহপাকের মহিমা। এই ১৫ মাসের মধ্যে আব্দুল্লাহ আতম এবং সেই পাদরির ছোটোখাটো কোনো বেমারও হলো না। এর মধ্যে মির্জা তার লোক লাগিয়ে তাদের হত্যার চেষ্টাও করেছিল; যাতে বলতে পারে, আমার ভবিষ্যদ্বাণীর কারণেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সেগুলোও সফল হয়নি।

পনেরো মাস যেদিন পূর্ণ হলো সেদিন খ্রিষ্টানরা বিজয় মিছিল বের করল। কিছুলোক তাকে হত্যার জন্য ঘেরাও করল। মির্জাকে সেদিন পুলিশ ডেকে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। মির্জা বলেছিল, সেদিন ঝাঁকেঝাঁকে খ্রিষ্টান মুসলমান হবে। একজন খ্রিষ্টানও সেদিন মুসলমান হওয়া দূরে থাক, উলটা তার আপন শালা নুসরাত বেগমের ভাই সাইয়্যিদ আহমদ সেদিন খ্রিষ্টান হয়ে গেল।

‘নুরুল ইসলাম’ কিতাবের পৃষ্ঠা-৮-এ লিখেছে, ‘আমি দেখলাম, একজন ফেরেশতা রক্তে জবুথবু হয়ে আমার সামনে এলেন। আমি বললাম ‘কী ব্যাপার?’ ফেরেশতা আমাকে বললেন, ‘আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় আজ সকল ফেরেশতারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে এভাবেই মাতম করছেন।’ নবিকে আল্লাহ বেইজ্তত করছেন আর ফেরেশতারা করছে শোক পালন!

কিতাব লিখে ধরা খাওয়া

কিছুদিন এভাবে মুনাযেরাবাজি করার পর মির্জার শখ হলো কিতাব লেখার। আত্মহের কথা জানাল বাল্যবন্ধু বাটালবিকে। বাটালবি বলল, ‘চিন্তা করো না, আমি দেখছি কী করা যায়।’ মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবি তখন এশাআতুস সুন্নাহ নামক পত্রিকার সম্পাদক।

মির্জা তার কিতাবের নাম ঠিক করল ‘বারাহিনে আহমদিয়া’। ঘোষণা করল, বারাহিনে আহমদিয়া ৫০ খণ্ড লেখা হবে। আর ইসলামের পক্ষে এমন দলিল দেওয়া হবে যে, পৃথিবীর কোনো মায়ের পুত্র নেই যেগুলোর জবাব দিতে পারে!

শুরু হলো লেখা। ১৮৮০-তে লিখল প্রথম খণ্ড। ৮১-তে দ্বিতীয় খণ্ড। ৮২-তে তৃতীয় এবং ৮৩-তে চতুর্থ খণ্ড। দেখা গেল, কোনো দলিল-টলিল নেই। খালি তার এহতেলামাত বা এলহামাত যাই হোক, সেগুলো দিয়েই ভর্তি।

অবশ্য দলিল একটা দিয়েছিল। সেটি ছিল এমন, ইসলাম সত্য ধর্ম, এর দলিল হলো ইসলামে ওলি এবং সাহেবে কাশফ ও কেরামত থাকেন। আর কোনো ধর্মে এমন নেই। এটা শুধু ইসলামেই আছে আর আমিই হলাম এই সময়ে ইসলামের প্রধান সাহেবে কাশফ ও কারামত।

কথাটা বলে বেশ বিপদেই পড়েছিল মির্জা। কারণ, লেকরাম নামের এক হিন্দু পণ্ডিত তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। বলল, ‘মির্জা একটা ভণ্ড। ওর কোনো কেরামত টেরামত নেই। আমি বিশ্বাস করি না।’

মির্জা বলল, ‘আমার কাছে এক বছর এসে থাকো। এর মধ্যে যদি কোনো কারামত দেখতে না পাও, তাহলে তোমার এক বছরের খরচা-পাতি যা হয় আমি দিয়ে দেবো। তবে শর্ত হলো এই এক বছরের মধ্যে আমাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।’

মির্জার জানা ছিল না এমন প্রস্তাবে কেউ রাজি হয়ে যেতে পারে। কার ঠেকা পড়েছে এভাবে এসে এক বছর পড়ে থাকে। কিন্তু পণ্ডিত লেকরাম রাজি হয়ে গেল। বলল, ‘আমি রাজি। আমি এক বছর তোমার ওখানে এসে থাকতে রাজি। কিন্তু যদি এর মধ্যে তোমার কোনো কেরামতি জাহির না হয়, তাহলে কী?’

মির্জা বলল, ‘তোমার এক বছরে যত টাকা খরচ হবে ফেরত দেবো, আর আমি মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত হবো।’

লেকরাম বলল, ‘আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এক বছরের খরচের টাকা ব্যাংকে জমা করছি। তুমিও করো। যদি এই এক বছরের মধ্যে তোমার একটি কেরামতিও জাহির হয়ে যায়, তাহলে আমার টাকা যাবে। আর নাহলে তোমার কথামত আমার এক বছরের খরচ আমি তুলে নেব।’

মির্জা বলল, ‘আচ্ছা।’

লেকরাম এক বছরের টাকা ব্যাংকে জমা করে জমা রিসিট মির্জাকে পাঠাল এবং বলল এবার তুমিও এক বছরের টাকা ব্যাংকে জমা করে আমাকে রিসিট দেখাও। মির্জার ধারণা ছিল না, লেকরাম এতটা সিরিয়াস হয়ে যাবে। সে ভাবল, বিপদ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। সে বলল, ‘ইয়ে গলত হে। কারামতি নিয়ে এভাবে চ্যালেঞ্জে যাওয়া ঠিক না।’

লেকরাম বলল, আমি আগেই জানতাম। তারপর সে মির্জার বারাহিনে আহমদিয়ার জবাবে ‘তকজিবে বারাহিনে আহমদিয়া’ নামে বিশাল সাইজের বই লিখে ফেলল একটা। বলল, ‘মির্জার ক্ষমতা থাকলে যেন জবাব দেয়।’

মির্জা লেকরামের জবাব দিতে না পেরে বলল, ‘লেকরাম আমার সাথে কঠিন গোস্তাখি করেছে। আমি আল্লাহর কাছে বলেছি। আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, লেকরামকে কঠিন আজাব দিয়ে মউত দেবেন।’ লেকরামও কম পিছলা ছিল না। সে বলল, ‘আমিও ওপরওলার কাছে দুআ করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন মির্জা কলেরায় মারা যাবে।’

ইতিহাস সাক্ষী। খতমে নবুওয়তের দুশমন মির্জা কাদিয়ানি কলেরায় মারা গিয়েছিল। আল্লাহপাক মির্জা বেইমানের মোকাবিলায় হিন্দু পণ্ডিতের কথাকে পর্যন্ত সত্যে পরিণত করে দিয়ে ভণ্ডটাকে চূড়ান্ত বেইজ্জতির সাথে দুনিয়া থেকে নিয়ে যান।

মির্জার এসব গাধামির কারণে পণ্ডিত লেকরাম তার কুল্লিয়াতে আরিয়া মুসাফির (Kulyat e Arya Musafir)-এ ইসলামের বিরুদ্ধে তিনশো অভিযোগ উপস্থাপন করে বসে। বসে বসে পাপ করে মির্জা আর পাপের বোঝা এসে পড়ে মুসলমানদের ঘাড়ে। সেই থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো মির্জায় লেকরামের জবাব দিয়েছে বলেও জানা যায়নি।